নামায পর্ব : كتاب الصلوة

1- عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الانصارى رأى الاذان في المنام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلالا فقام بلال فاذن مثنى مثنى -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الاذان لغة واصطلاحا؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ بين - او ما معنى الاذان والاقامة؟ وما الحكمة في مشروعيتهما؟ وضح ذلك -

2- ما الترجيع في الاذان؟ وما حكمه؟ بين ذلك -

3- بين قصة بدإ الاذان مفصلا –

4- اجابة الاذان مستحب ام واجب؟ هات بأراء العلماء فيها -

5- بين سنن الاذان والاقامة -

6- هل شرع الاذان والاقامة بالوحي ام بالرؤيا ؟ هل الرؤيا حجة شرعية؟ بين موضحا

7- من رأى الاذان اولا؟ ولم لم يأمره النبي ﷺ بالاذان مع كونه احق به عن غيره؟

8- كم موضعا يستن فيه الاذان بغير الصلوات الخمس؟

9- هل يجوز للنساء الاذان والاقامة؟ بين اختلاف العلماء في هذه المسئلة -

10-متى شرع الاذان؟ وما الاختلاف في تعيين وقت الاذان ؟

11-بين اختلاف الائمة في عدد كلمات الاذان والاقامة بالدلائل الواضحة مع قول الامام ابي جعفر الطحاوى (رح) فيه –

12-اكتب ما تعرف عن نبذة بلال رضى الله عنه مختصرا –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الانصارى رأى الاذان في المنام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلالا فقام بلال فاذن مثنى مثنى.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি আযানের বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৪৯৯), ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর সুনানে তিরমিজি (হাদিস নং ১৮৯) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' বা বিশুদ্ধ এবং আযানের শরয়ী ভিত্তি হিসেবে গণ্য।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর সাহাবায়ে কেরাম নামাজের জামাতের জন্য একত্রিত হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেউ শিঙা ফুঁকানোর, কেউ ঘণ্টা বাজানোর এবং কেউ আগুন প্রজ্বলনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এগুলো ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের প্রথা হওয়ায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখেন। এই প্রেক্ষাপটেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীগণ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (রা.) স্বপ্নে আযান (দেওয়ার পদ্ধতি) দেখেন। এরপর তিনি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে তা জানালেন। তিনি (রাসুলুল্লাহ সা.) বললেন: "তুমি এটা বিলালকে শিখিয়ে দাও।" অতঃপর বিলাল (রা.) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন এবং তিনি বাক্যগুলো দুই দুই বার করে উচ্চারণ করলেন।

ব্যাখ্যা: আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে একজন ফিরিশতাকে সবুজ পোশাকে আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে দেখেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)

স্বপ্নটি শুনে একে 'রুইয়ায়ে হাক্কাহ' বা সত্য স্বপ্ন বলে সত্যায়ন করেন। হযরত বিলাল (রা.)-এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও সুমিষ্ট হওয়ায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকেই আযান দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন। হাদিসের 'মাসনা মাসনা' (দুই দুই বার) দ্বারা আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (যেমন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযানের বিধান স্বপ্নের মাধ্যমে শুরু হলেও তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদন (তাকরির) এবং পরবর্তীতে ওহির মাধ্যমে শরয়ী বিধান হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলা সুন্নাহ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে আযান কী? এর প্রবর্তনের হেকমত বর্ণনা করো। অথবা, আযান ও ইকামতের অর্থ কী এবং এ দুটির প্রবর্তনের হেকমত কী? (ما معنى الاذان لغة واصطلاحا؟ وما الحكمة في مشروعيته؟)

উত্তর:

আযানের পরিচয়:

- আভিধানিক অর্থ: আযান (الأذان) শব্দটি আরবি। এর মূলধাতু 'আযন' (أذن)। আভিধানিক অর্থ হলো ঘোষণা দেওয়া, সংবাদ দেওয়া বা জানানো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

অর্থ: এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও। (সূরা হজ: ২৭)

- পারিভাষিক অর্থ: শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট বাক্য দ্বারা, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজের জন্য মানুষকে আহ্বান করাকে আযান বলা হয়। ফিকহবিদগণ বলেন: "আল-আযানু হুয়া আল-ইলামু বি-ওয়াক্তিস সালাতি বি-আলফাযিন মাখসুসাতিন" (নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা দেওয়া)।

ইকামতের পরিচয়:

- অর্থ: ইকামত (الإقامة) অর্থ দাঁড় করানো বা প্রতিষ্ঠিত করা।
- পারিভাষিক অর্থ: জামাত শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে উপস্থিত মুসল্লিদের নামাজের জন্য দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বাক্যগুলো উচ্চস্বরে বলাকে ইকামত বলে।

আযান ও ইকামত প্রবর্তনের হেকমত (দর্শন ও উদ্দেশ্য):

১. তাওহিদের ঘোষণা: আযানের মাধ্যমে দিনে পাঁচবার আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ (তাওহিদ) ও বড়ত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়, যা কুফরি ও শিরকি শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় বার্তা।

২. জামাতে উপস্থিতি নিশ্চিত করা: মুসলিমরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। আযানের মাধ্যমে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, দুনিয়াবি কাজের চেয়ে আল্লাহর ইবাদত উত্তম। 'হাইয়া আলাস সালাহ' (নামাজের দিকে এসো) এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' (কল্যাণের দিকে এসো) বাক্যদ্বয় এই আহ্বান জানায়।

৩. ইসলামি শিয়ার বা নিদর্শন: আযান হলো মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রধান নিদর্শন (শিযার)। কোনো জনপদে আযান ধ্বনিত হওয়া প্রমাণ করে যে, সেটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এটি ইসলামের প্রকাশ্য প্রতীক।

৪. আত্মিক প্রস্তুতি: ইকামতের মাধ্যমে মুসল্লিদের মন ও শরীরকে নামাজের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

অর্থ: যখন নামাজের সময় হয়, তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে যেন ইমামতি করে। (সহিহ বুখারি)

---

২. আযানে 'তারজি' (الترجيع) কী? এবং এর হুকুম কী? (ما الترجيع في الاذان؟ وما حكمه؟ بين ذلك)

উত্তর:

তারজি (الترجيع) এর পরিচয়:

'তারজি' শব্দের অর্থ হলো পুনরাবৃত্তি করা বা ফিরিয়ে আনা। আযানের পরিভাষায়, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ'—এই শাহাদাতাইন বা সাক্ষ্যবাণী দুটি প্রথমে নিম্নস্বরে (নিজে শুনবে এমন আওয়াজে) বলা এবং এরপর পুনরায় উচ্চস্বরে বলাকে 'তারজি' বলা হয়।

তারজির হুকুম ও ফিকহি মতভেদ:

এই মাসআলাটি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মত:

তাঁদের মতে, আযানে তারজি করা সুন্নাহ। তাঁদের দলিল হলো হযরত আবু মাহজুরা (রা.) বর্ণিত হাদিস। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আযান শিক্ষা দেওয়ার সময় তারজির নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে শাহাদাতাইনের বাক্যগুলো চারবার করে (দুইবার নিম্নস্বরে, দুইবার উচ্চস্বরে) উল্লেখ রয়েছে। তাই তাদের মতে আযানের বাক্য সংখ্যা ১৯টি (তারজিসহ)।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাবের মত:

হানাফি মাযহাব মতে, আযানে তারজি করা সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ, শাহাদাতাইনের বাক্যগুলো সরাসরি উচ্চস্বরে দুইবার করে বলাই যথেষ্ট। নিচু স্বরে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাদের দলিল:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নে দেখা আযানের হাদিস (আলোচ্য হাদিসটি)। সেখানে আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে (মাসনা মাসনা) উল্লেখ করা হয়েছে, তারজির কোনো উল্লেখ নেই। আর এটিই ছিল মদিনার আযান এবং হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিলাল (রা.) যে আযান দিতেন, তাতে তারজি ছিল না। আবু মাহজুরা (রা.)-কে তারজি শেখানো হয়েছিল শিক্ষার উদ্দেশ্যে, আমল হিসেবে নয়—এমন ব্যাখ্যা হানাফি ফকিহগণ দিয়ে থাকেন।

উপসংহার:

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি এবং তারজি নেই। তবে শাফেয়ি মাযহাবে তারজি সুন্নাহ। উভয় পদ্ধতিই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত,

তবে হানাফি ফকিহগণ হযরত বিলাল (রা.)-এর আযানকে 'মুতাওয়াতির' (ধারাবাহিক আমল) হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

---

৩. আযান শুরুর ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করো। (بين قصة بدإ الاذان مفصلا)

উত্তর:

আযান প্রবর্তনের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত চমৎকার ঘটনা। এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ১ম সনে মদিনায়। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

পরামর্শ সভা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় আসার পর এবং মসজিদে নববি নির্মাণের পর নামাজের জামাতের জন্য মানুষকে ডাকার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

- কেউ প্রস্তাব দিলেন: নামাজের সময় হলে আমরা আগুন জ্বালাব, ধোঁয়া দেখে মানুষ আসবে। রাসুল (সা.) বললেন, "এটি অগ্নিপূজক (মাজুস)-দের প্রথা।"
- কেউ প্রস্তাব দিলেন: ঘণ্টা বাজানো হোক। নবীজি (সা.) বললেন, "এটি খ্রিস্টানদের প্রথা।"
- কেউ বললেন: শিঙা ফুঁকানো হোক। তিনি বললেন, "এটি ইহুদিদের প্রথা।"

সভা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো। সাহাবিরা চিন্তিত মনে ঘরে ফিরলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্ন:

সেদিন রাতে আনসার সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় হাতে একটি ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আব্দুল্লাহ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি ঘণ্টাটি বিক্রি করবেন?" লোকটি বলল, "দিয়ে কী করবে?" তিনি বললেন, "নামাজের জন্য মানুষকে ডাকব।" লোকটি বলল, "আমি কি তোমাকে এর

চেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দেব না?" এরপর সেই ফিরিশতা তাঁকে আযানের বাক্যগুলো এবং ইকামতের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলেন।

রাসুলের দরবারে:

সকালে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে স্বপ্নটি বর্ণনা করলেন। শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থ: ইনশাআল্লাহ, এটি নিঃসন্দেহে একটি সত্য স্বপ্ন।

বিলাল (রা.)-এর আযান:

রাসুলুল্লাহ (সা.) আব্দুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও এবং তুমি যা দেখেছ তা তাকে বলে দাও, সে যেন তা দিয়ে আযান দেয়। কারণ, তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উচ্চ ও সুমিষ্ট।" বিলাল (রা.) সেই বাক্যগুলো দিয়ে আযান দেওয়া শুরু করলেন। মদিনার ঘরে ঘরে সেই ধ্বনি পৌঁছে গেল। হযরত ওমর (রা.) এই আওয়াজ শুনে চাদর টানতে টানতে দৌড়ে এলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমিও ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছি!" রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর।"

এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে আযানের সূচনা হয়।

---

৪. আযানের জবাব দেওয়া কি মুস্তাহাব না ওয়াজিব? আলেমদের মতামত উল্লেখ করো। (اجابة الاذان مستحب ام واجب؟ هات بأراء العلماء فيها)

উত্তর:

আযান শোনার পর শ্রোতার জন্য মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বাক্য বলা বা আযানের জবাব দেওয়া একটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। এ বিধানের পর্যায় (হুকুম) নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. জুমহুর উলামা (অধিকাংশ আলেম) এর মত:

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ (রহ.) এবং অধিকাংশ হানাফি ফকিহদের মতে, আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মুস্তাহাব (সুন্নাহ)। এটি ওয়াজিব নয়।

যুক্তি: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসটিতে আদেশের সুর থাকলেও তা উৎসাহমূলক। যেমন জুম্মার নামাজের আযানের পর বেচাকেনা বন্ধ করা ওয়াজিব, কিন্তু অন্য সময় আযানের জবাব দেওয়া আবশ্যক নয়। যদি ওয়াজিব হতো, তবে সাহাবিরা সব কাজ ফেলে জবাব দিতেন, কিন্তু এমন প্রমাণ সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

২. হানাফি (কোনো কোনো ফকিহ) ও জাহেরি সম্প্রদায়ের মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি মত এবং জাহেরি সম্প্রদায়ের মতে, আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

অর্থ: যখন তোমরা আযান শোনো, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলো। (সহিহ বুখারি)

এখানে 'কুলু' (বলো) শব্দটি আমর বা আদেশের সূচক। উসুলের নীতি অনুযায়ী, আদেশ সাধারণত ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

হানাফি মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (ফতোয়া):

হানাফি মাযহাবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, আযানের জবাব দেওয়া দুই প্রকার:

ক. ইজাবাত বিল কদম (পায়ে হেঁটে জবাব দেওয়া): অর্থাৎ জামাতে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদে যাওয়া। এটি সুন্নাহ মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিবের কাছাকাছি।

খ. ইজাবাত বিল লিসান (মুখে জবাব দেওয়া): মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে বাক্যগুলো উচ্চারণ করা। এটি মুস্তাহাব ও অনেক সওয়াবের কাজ।

তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এর জবাবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা সুন্নাহ।

৫. আযান ও ইকামতের সুন্নতসমূহ বর্ণনা করো। (بين سنن الاذان والاقامة)

উত্তর:

আযান ও ইকামত শুদ্ধ ও সুন্দর হওয়ার জন্য কিছু সুন্নাত রয়েছে যা পালন করলে এর সওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নিচে প্রধান সুন্নাতগুলো আলোচনা করা হলো:

আযানের সুন্নাতসমূহ:

১. পবিত্রতা: মুয়াজ্জিনের ওজু থাকা সুন্নাত। ওজু ছাড়া আযান দেওয়া মাকরুহ তানজিহি।

২. উচ্চ স্থান: আযান উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত, যাতে আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে (মাইক থাকলে সমতলে দেওয়াই যথেষ্ট)।

৩. কিবলামুখী হওয়া: আযান ও ইকামত দেওয়ার সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত।

৪. কানে আঙুল দেওয়া: আযানের সময় দুই কানে শাহাদাত আঙুল প্রবেশ করানো সুন্নাত। এতে আওয়াজ উচ্চ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিলাল (রা.)-কে বলেছিলেন: "কানে আঙুল দাও, এটি তোমার আওয়াজকে উচ্চ করবে।"

৫. ডানে ও বামে ফেরা: 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে চেহারা ঘোরানো সুন্নাত। তবে বুক কিবলামুখীই থাকবে।

৬. তারতিল (ধীরস্থিরতা): আযানের বাক্যগুলো টেনে টেনে ধীরস্থিরভাবে উচ্চারণ করা। দুই বাক্যের মাঝখানে বিরতি দেওয়া।

৭. সুমিষ্ট কণ্ঠ: মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও উচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইকামতের সুন্নাতসমূহ:

১. হদর (দ্রুততা): ইকামত আযানের চেয়ে দ্রুত গতিতে দেওয়া সুন্নাত। বিরতি কম হবে।

২. মসজিদের ভেতরে দেওয়া: আযান বাইরে দেওয়া হলেও ইকামত মসজিদের ভেতরে দেওয়া সুন্নাত।

৩. বাক্য সংখ্যা: হানাফি মাযহাবে ইকামতের বাক্য ১৭টি (কদ কামাতিস সালাহ দুইবারসহ)।

৪. দাঁড়ানো: দাঁড়িয়ে ইকামত দেওয়া সুন্নাত।
দলিল:
হাদিসে এসেছে:
اجْعَلْهَا رَوْحًا
অর্থ: আযানের বাক্যগুলোকে বিরতি দিয়ে প্রশান্তির সাথে বলো। (তিরমিজি)

---

৬. আযান ও ইকামত কি ওহির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছে নাকি স্বপ্নের মাধ্যমে? স্বপ্ন কি শরয়ী দলিল হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। (هل شرع الاذان والاقامة بالوحي ام بالرؤيا ؟ هل الرؤيا حجة شرعية؟ بين موضحا)

উত্তর:
আযান ও ইকামতের উৎস:
আযান ও ইকামতের সূচনা হয়েছিল সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর সত্য স্বপ্নের (রুইয়া) মাধ্যমে। কিন্তু এর বৈধতা ও শরয়ী বিধান (মাশরুয়িয়াত) সাব্যস্ত হয়েছে ওহির মাধ্যমে।
ব্যাখ্যা হলো, স্বপ্ন দেখার পর যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তা জানানো হলো, তখন তিনি বললেন, *"এটি সত্য স্বপ্ন।"* এবং তিনি বিলাল (রা.)-কে সেই অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই নির্দেশ এবং সমর্থন (তাকরির) মূলত 'ওহি গায়রে মাতলু' বা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কিছু বর্ণনায় এসেছে, হযরত জিবরাইল (আ.)-ও আযানের হুকুম নিয়ে এসেছিলেন। তাই বলা যায়, স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদনের কারণেই তা দ্বীনের অংশ হয়েছে।
স্বপ্ন কি শরয়ী দলিল হতে পারে?
শরয়ী দলিলে স্বপ্নের অবস্থান দুই ধরনের:
১. নবীদের স্বপ্ন: নবীদের স্বপ্ন নিঃসন্দেহে 'ওহি' এবং তা শরয়ী দলিল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমেই পুত্র কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. সাধারণ মানুষের স্বপ্ন (এমনকি সাহাবিদেরও): নবীদের ছাড়া অন্য কারো স্বপ্ন স্বতন্ত্র শরয়ী দলিল (হুজ্জাত) হতে পারে না। স্বপ্নে কোনো নির্দেশ পেলেই তা শরীয়তের আইন হয়ে যায় না।

বিশ্লেষণ:

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্ন দলিল হয়েছে শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর তাসদিক বা সত্যায়নের কারণে। রাসুলুল্লাহ (সা.) যদি একে অনুমোদন না দিতেন, তবে কেবল সাহাবির স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে আযান চালু হতো না। অতএব, মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহই এখানে দলিল, স্বপ্নটি ছিল মাধ্যম বা উপলক্ষ মাত্র। বর্তমানে ওহির দরজা বন্ধ, তাই এখন কারো স্বপ্ন দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান পরিবর্তন বা নতুন বিধান চালু করা যাবে না।

---

৭. সর্বপ্রথম কে আযান স্বপ্নে দেখেছিলেন? এবং কেন নবীজি (সা.) তাকে আযান দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন না, অথচ তিনিই এর বেশি হকদার ছিলেন? (من رأى الاذان اولا؟ ولم لم يأمره النبي ﷺ بالاذان مع كونه احق به عن غيره؟)

উত্তর:

সর্বপ্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা:

আযান সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেখেছিলেন আনসার সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহি (রা.)। পরবর্তীতে একই রাত্রে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-ও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তাকে দায়িত্ব না দেওয়ার কারণ:

স্বাভাবিক যুক্তিতে মনে হতে পারে যে, যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নটি দেখেছেন এবং শব্দগুলো শিখেছেন, তাই আযান দেওয়ার প্রথম হকদার বা অধিকার তাঁরই ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বাদ দিয়ে হযরত বিলাল (রা.)-কে মুয়াজ্জিন নিয়োগ করেন। এর পেছনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রজ্ঞা ও সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই সেই কারণ ব্যাখ্যা করেছেন:

فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
অর্থ: তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও এবং তুমি যা দেখেছ তা তাকে শিখিয়ে দাও, সে যেন তা দিয়ে আযান দেয়। কারণ, তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উচ্চ ও সুমিষ্ট। (সুনানে আবু দাউদ)

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যোগ্যতাই মাপকাঠি: ইসলামে পদের জন্য আবেগ বা অধিকারের চেয়ে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আযানের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দূর থেকে ডাকা। তাই যার কণ্ঠস্বর বেশি জোরালো এবং মধুর, তাকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. দলগত কাজ: এখানে আব্দুল্লাহ (রা.) হলেন স্বপ্নদ্রষ্টা ও শিক্ষক, আর বিলাল (রা.) হলেন বাস্তবায়নকারী। রাসুলুল্লাহ (সা.) দুজনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে দলগত কাজের (Teamwork) দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এতে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মনে কোনো কষ্ট ছিল না, বরং তিনি আনন্দের সাথে বিলালকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

---

৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া আর কতটি স্থানে আযান দেওয়া সুন্নাত? (كم موضعا يسنن فيه الاذان بغير الصلوات الخمس؟)

উত্তর:

আযান মূলত পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের জন্য সুন্নাত। তবে ফকিহগণ হাদিসের আলোকে আরও বেশ কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে আযান দেওয়াকে মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলেছেন। শাফেয়ি ও হানাফি ফকিহদের মতে এই স্থানগুলো প্রায় ১০টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

১. নবজাতকের কানে: শিশু জন্মগ্রহণ করার পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসান (রা.)-এর কানে আযান দিয়েছিলেন। (তিরমিজি)

২. অগ্নিকাণ্ডের সময়: কোথাও আগুন লাগলে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত। এতে আগুন নেভাতে আল্লাহ সাহায্য করেন বলে বর্ণিত আছে।

৩. যুদ্ধের ময়দানে: যুদ্ধের সময় মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচতে আযান দেওয়া।

৪. জিন বা শয়তানের উপদ্রব হলে: যদি জনমানবহীন প্রান্তরে জিন-ভূতের ভয় দেখা দেয়, তবে আযান দিলে শয়তান পলায়ন করে। হাদিসে আছে, "শয়তান আযান শুনলে বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালায়।"
৫. মৃগী রোগী বা রাগান্বিত ব্যক্তির কানে: কেউ অতিরিক্ত রেগে গেলে বা জিনগ্রস্ত হলে তার কানে আযান দিলে সে শান্ত হয়।
৬. পথ ভুলে গেলে: মরুভূমি বা নির্জন স্থানে পথ হারিয়ে ফেললে আযান দেওয়া।
৭. মৃতদেহ দাফনের সময় (মতভেদপূর্ণ): কেউ কেউ কবরে লাশ রাখার পর আযান দেওয়াকে জায়েজ বললেও অধিকাংশ ফকিহ এবং হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মতে এটি বিদআত। এটি করা যাবে না।
মূলত নামাজের বাইরে এই আযানগুলো দেওয়া হয় 'জিকর' বা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে বিপদ আপদ দূর করার উদ্দেশ্যে।

---

৯. নারীদের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া কি জায়েজ? এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করো। (هل يجوز للنساء الاذان والاقامة؟ بين اختلاف العلماء في هذه المسئلة)

উত্তর:

নারীদের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশের মতে এটি তাদের জন্য বিধিসম্মত নয়।
১. হানাফি মাযহাব:
নারীদের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরুহ তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি অপছন্দনীয়)। যদি তারা জামাতে নামাজ পড়ে বা একাকী পড়ে, কোনো অবস্থাতেই তাদের ওপর আযান-ইকামত ওয়াজিব বা সুন্নাত নয়। যদি তারা আযান দেয়, তবে তা আদায় হবে না এবং গুনাহগার হবে।
যুক্তি: আযানের জন্য উচ্চস্বরের প্রয়োজন হয়। নারীদের কণ্ঠস্বর পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করা ফিতনার কারণ হতে পারে। তাই তাদের আযানের অনুমতি নেই।
২. শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব:

- যদি নারীরা পুরুষদের উপস্থিতিতে আযান দেয়, তবে তা হারাম বা নাজায়েজ।
- তবে যদি নারীরা নিজেদের জামাতে নামাজ পড়ে যেখানে কোনো পরপুরুষ নেই, তবে তাদের জন্য ইকামত দেওয়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। আযানের ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবে দুটি মত আছে—একটি মতে, উচ্চস্বর ছাড়া কেবল নিজেদের শোনানোর জন্য আযান দেওয়া জায়েজ। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো, তাদের জন্য আযান নেই, শুধু ইকামত আছে।

৩. হাম্বলি মাযহাব:

নারীদের জন্য আযান ও ইকামত কোনোটিই সুন্নাত নয়। তবে যদি দেয়, তবে তা জায়েজ (মাকরুহ হবে না)।

দলিল:

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

অর্থ: নারীদের ওপর আযান ও ইকামতের কোনো দায়িত্ব নেই। (বায়হাকি)

হযরত আয়েশা (রা.) আযান দিতেন—এমন বর্ণনা থাকলেও তা ইজতিহাদি এবং জুমহুর ফকিহগণ তা গ্রহণ করেননি।

সিদ্ধান্ত: নারীদের জন্য উত্তম হলো আযান-ইকামত ছাড়াই নামাজ আদায় করা।

---

১০. আযান কখন প্রবর্তিত হয়? আযানের সময় নির্ধারণে কী কী মতভেদ আছে? (متى شرع الاذان؟ وما الاختلاف في تعيين وقت الاذان ؟)

উত্তর:

আযান প্রবর্তনের সময়কাল:

আযান মদিনায় হিজরতের পর প্রবর্তিত হয়েছে—এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত। তবে সঠিক সন ও সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

১. প্রথম হিজরি (প্রসিদ্ধ মত): অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসদের মতে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় আগমনের প্রথম বছরেই (১ম হিজরি) মসজিদে

নববি নির্মাণের পরপরই আযানের বিধান চালু হয়। এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।

২. দ্বিতীয় হিজরি: ইবনে জারির তাবারি ও অন্যান্য কিছু ঐতিহাসিকের মতে, আযান ২য় হিজরিতে প্রবর্তিত হয়েছে। তখন কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল।

৩. মক্কি জীবনে (বিরল মত): কেউ কেউ বলেন, মেরাজের রাতেই নামাজের সাথে আযান ফরজ হয়েছিল মক্কায়। কিন্তু হিজরতের আগে তা প্রকাশ্যে দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে এই মতটি দুর্বল।

স্থান ও প্রেক্ষাপট:

আযান মদিনাতেই বিধিবদ্ধ হয়েছে। কারণ মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারের কারণে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নামাজ পড়ার পরিবেশ ছিল না। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, যখন মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন হয়, তখনই আল্লাহ তাআলা এই বিধান দান করেন।

সিদ্ধান্ত: বিশুদ্ধতম মত হলো, আযান হিজরতের প্রথম বছরেই চালু হয়েছে।

---

১১. আযান ও ইকামতের শব্দের সংখ্যা নিয়ে ইমামগণের মতভেদ স্পষ্ট দলিলসহ বর্ণনা করো এবং এ বিষয়ে ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.)-এর বক্তব্য লেখ। (بين اختلاف الائمة في عدد كلمات الاذان والاقامة بالدلائل الواضحة مع قول الامام ابي جعفر الطحاوى (رح) فيه)

উত্তর:

আযান ও ইকামতের বাক্যের সংখ্যা নিয়ে প্রধানত দুটি মত প্রচলিত আছে:

১. হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব:

- আযান: ১৫ বাক্য (তারজি ছাড়া)। আল্লাহু আকবার ৪ বার শুরুতে।
- ইকামত: ১৭ বাক্য। আযানের মতোই, তবে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর 'কদ কামাতিস সালাহ' ২ বার যোগ হবে।
- দলিল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর মূল হাদিস, যেখানে শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় (মাসনা মাসনা) বলা হয়েছে।

এবং হযরত বিলাল (রা.) আজীবন এই পদ্ধতিতেই আযান ও ইকামত দিয়েছেন।

২. শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব:

- আযান: ১৯ বাক্য (তারজিসহ)। শাহাদাতাইনের ৪টি বাক্য অতিরিক্ত।
- ইকামত: ১১ বাক্য। আল্লাহু আকবার শুরুতে ২ বার এবং শেষে ২ বার। বাকি সব ১ বার করে। শুধু 'কদ কামাতিস সালাহ' ২ বার। (মালিকি মতে এটিও ১ বার)।
- দলিল: মক্কা বিজয়ের পর আবু মাহজুরা (রা.)-কে রাসুল (সা.) যে আযান শিখিয়েছিলেন, তাতে তারজি ছিল এবং ইকামতের বাক্য একবার করে ছিল।

ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর বক্তব্য ও সমাধান:

ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) তাঁর শরহু মাআনিল আসার গ্রন্থে এ বিষয়ে চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। তিনি হানাফি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো:

১. ধারাবাহিক আমল: হযরত বিলাল (রা.) মদিনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত যে আযান ও ইকামত দিয়েছেন, তাতে তারজি ছিল না এবং ইকামতের শব্দ দুইবার করে ছিল। এটি 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা ধারাবাহিক আমল।

২. আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিসের ব্যাখ্যা: তিনি বলেন, আবু মাহজুরা (রা.) নতুন মুসলিম ছিলেন। তাই নবীজি (সা.) তাঁকে শেখানোর জন্য শাহাদাতাইনের বাক্যগুলো প্রথমে আস্তে এবং পরে জোরে বলিয়েছিলেন। এটি ছিল শিক্ষার পদ্ধতি, আযানের মূল অংশ নয়।

৩. কিয়াস: আযান যেমন ঘোষণার জন্য, ইকামতও ঘোষণার জন্য। আযানের শব্দ যেমন দুইবার, ইকামতের শব্দও দুইবার হওয়া যুক্তিযুক্ত।

অতএব, ইমাম তাহাবির মতে, হানাফি মাযহাবের আমলটিই (আযানে ১৫ ও ইকামতে ১৭ শব্দ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বশেষ এবং স্থায়ী সুন্নাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১২. হযরত বিলাল (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب ما تعرف عن نبذة بلال رضى الله عنه مختصرا)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম বিলাল, পিতার নাম রাবাহ এবং মাতার নাম হামামাহ। তিনি 'আবু আব্দুল্লাহ' বা 'আবু আবদুর রহমান' কুনিয়াত বা উপনামে পরিচিত। তিনি ইথিওপিয়ান (হাবশি) বংশোদ্ভূত এবং গায়ের রঙ ছিল কালো। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি।

ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতন:

তিনি 'আস-সাবিকুনাল আউয়ালুন' বা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করত। মক্কার উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে বুকের ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। তবুও তিনি কেবল 'আহাদ, আহাদ' (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলে চিৎকার করতেন। পরে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে কিনে মুক্ত করে দেন।

আযানের দায়িত্ব ও মর্যাদা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে তাঁর সুউচ্চ ও দরদি কণ্ঠের কারণে মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি সফর ও মুকিম অবস্থায় রাসুল (সা.)-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। রাসুল (সা.) মেরাজে গিয়ে জান্নাতে তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনেছেন বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

রাসুলের ওফাতের পর:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি শোকে মদিনায় আযান দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে শামে (সিরিয়া) চলে যান। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সময় হযরত ওমরের অনুরোধে তিনি শেষবারের মতো আযান দিয়েছিলেন, যা শুনে সাহাবিরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ২০ হিজরি মতান্তরে ১৮ হিজরিতে শামের দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। সেখানে 'বাবুস সগির' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০-এর অধিক। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

2- عن انس بن مالك قال كانوا قد ارادوا أن يضربوا بالناقوس وان يرفعوا نارا لأعلام الصلوة حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما المراد بقوله : "ذلك الرجل تلك الرويا" ؟
2- هل الترجيع ثابت في الاذان والاقامة؟ والا كيف فعل ابو محذورة ؟
3- ما الاختلاف في عدد كلمات الاذان والاقامة؟ بين القول الراجح عند الامام ابي جعفر الطحاوي–
4- هل يثبت حكم الشريعة بالرؤيا ؟ والا كيف شرع الاذان بناء على رؤيا بعض الصحابة ؟
5- ما معنى الاذان والاقامة؟ وما الحكمة في مشروعية الاذان ؟
6- ما الترجيع في الاذان وما حكمه ؟
7- بين سنن الاذان والاقامة –
8- لم عين رسول الله ﷺ بلالا للتأذين؟ اذكر-
9- هل يتلفظ كلمات الاذان شفعا ام وترا؟ حقق المسئلة –
10-ما هو الناقوس والقرن؟ ولم لم يتخذهما النبي ﷺ لاعلام الصلوات ؟
11-هل يجوز للمؤذن ان يأخذ اجرة على الاذان ؟
12-ما الاختلاف بين العلماء والفقهاء في ايتار الاقامة ؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن انس بن مالك قال كانوا قد ارادوا أن يضربوا بالناقوس وان يرفعوا نارا لأعلام الصلوة حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة.

١. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি আযানের বাক্য সংখ্যা ও পদ্ধতি নির্ধারণে একটি মূলনীতিমূলক হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ৬০৫), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৩৭৭), ইমাম তিরমিজি এবং নাসায়ি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' (বুখারি ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন) হওয়ায় এটি অত্যন্ত শক্তিশালী দলিলের মর্যাদা রাখে।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মদিনায় হিজরতের পর সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় মানুষকে একত্রিত করার উপায় খুঁজছিলেন। কেউ খ্রিস্টানদের মতো 'নাকুস' (ঘণ্টা) ব্যবহারের প্রস্তাব দেন, আবার কেউ ইহুদিদের মতো শিঙা বা অগ্নিপূজকদের মতো আগুন জ্বালানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) ভিন্নধর্মী সাদৃশ্যের কারণে এসব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সংকটময় মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযান দেখার পর এই সমস্যার সমাধান হয়। সেই প্রেক্ষাপটেই এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় জানানোর জন্য 'নাকুস' (ঘণ্টা) বাজানোর ইচ্ছা করেছিলেন এবং আগুন জ্বালানোর কথাও ভেবেছিলেন। অবশেষে 'সেই ব্যক্তি' (আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ) 'সেই স্বপ্নটি' (আযানের স্বপ্ন) দেখলেন। অতঃপর (রাসুলুল্লাহ সা. এর নির্দেশে) বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো, তিনি যেন আযানের বাক্যগুলো 'জোড়ায় জোড়ায়' (শাফ'আ) বলেন এবং ইকামতের বাক্যগুলো 'বিজোড়' (বিতর) বা একবার করে বলেন।

ব্যাখ্যা:

- **নাকুস (ঘণ্টা) ও আগুন:** এগুলো যথাক্রমে খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের প্রতীক হওয়ায় ইসলামে গৃহীত হয়নি।
- **শাফ'আ (জোড়):** আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে বলা। যেমন- 'আল্লাহু আকবার' দুইবার, 'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার।

- **বিতর (বিজোড়):** ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা। তবে হানাফি মাযহাব মতে, এখানে 'বিতর' দ্বারা দ্রুত বলা বা সংখ্যার ভিন্নতা বোঝানো হয়েছে, কারণ অন্য সহিহ হাদিসে ইকামতের বাক্যও দুইবার করে বলার প্রমাণ রয়েছে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস দ্বারা আযান ও ইকামতের মৌলিক পার্থক্য বোঝা যায়। আযান দীর্ঘ ও ধীরস্থিরভাবে (জোড়ায় জোড়ায়) দিতে হয়, আর ইকামত সংক্ষিপ্ত বা দ্রুত (বিজোড় বা একবার করে) দিতে হয়। তবে মাযহাবভেদে ইকামতের বাক্য সংখ্যার ভিন্নতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. হাদিসে উল্লিখিত "সেই ব্যক্তি" এবং "সেই স্বপ্ন" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله : "ذلك الرجل تلك الرويا" ؟)

উত্তর:

হাদিসে হযরত আনাস (রা.) সংক্ষেপে "ذلك الرجل" (সেই ব্যক্তি) এবং "تلك الرؤيا" (সেই স্বপ্ন) শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

"সেই ব্যক্তি" (ذلك الرجل) এর পরিচয়:

তিনি হলেন বিশিষ্ট আনসার সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহি (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। বদর, উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যদিও আযানের স্বপ্নের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-ও শরিক ছিলেন (তিনিও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন), কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এই স্বপ্নের কথা জানানোর কারণে হাদিসে তাঁকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। আনাস (রা.) এখানে নাম উল্লেখ না করে 'সেই ব্যক্তি' বলেছেন সম্মানের জন্য অথবা ঘটনাটি সাহাবিদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে নাম বলার প্রয়োজন হয়নি।

"সেই স্বপ্ন" (تلك الرؤيا) এর বিবরণ:

এখানে সেই ঐতিহাসিক স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে আযানের সূচনা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে দেখেন, এক ব্যক্তি

(ফেরেশতা) হাতে ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘণ্টাটি কিনতে চাইলেন নামাজের সময় জানানোর জন্য। তখন ফেরেশতা বললেন, "আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দেব না?" এরপর তিনি তাঁকে আযানের বাক্যগুলো (আল্লাহু আকবার... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং ইকামতের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলেন।

স্বপ্নে দেখা আযানটি ছিল অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তাওহিদের ঘোষণায় ভরপুর। সকালে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এই স্বপ্নের কথা জানালে নবীজি (সা.) বলেন:

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি একটি সত্য স্বপ্ন।

এই স্বপ্নের ফলেই মুসলিম উম্মাহ হাজার বছর ধরে নামাজের জন্য সুমধুর আহ্বান পেয়ে আসছে। সুতরাং, 'সেই স্বপ্ন' বলতে আযান ও ইকামতের পদ্ধতি সম্বলিত স্বপ্নকেই বোঝানো হয়েছে।

---

২. আযান ও ইকামতে কি 'তারজি' (পুনরাবৃত্তি) প্রমাণিত? অন্যথায় আবু মাহজুরা (রা.) কীভাবে তা করলেন? (هل الترجيع ثابت في الاذان والاقامة؟ والا كيف فعل ابو محذورة ؟)

উত্তর:

তারজি (الترجيع) এর বিধান:

'তারজি' হলো আযানে শাহাদাতাইনের (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) বাক্যগুলো প্রথমে নিচু স্বরে এবং পরে উচ্চস্বরে বলা। আযান ও ইকামতে 'তারজি' প্রমাণিত কি না—এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতে, আযান ও ইকামতে তারজি সুন্নাত নয় বা প্রমাণিত আমল নয়।

- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নে দেখা আযান এবং মদিনায় হযরত বিলাল (রা.)-এর আজীবন দেওয়া আযানে তারজি ছিল না। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত মদিনার

মসজিদে নববীতে যে আযান প্রচলিত ছিল, তা তারজিবিহীন ছিল। হাদিসে এসেছে:

كَانَ أَذَانُ بِلالٍ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً لا تَرْجِيعَ فِيهِ

অর্থ: বিলালের আযান ছিল ১৫ বাক্যের, তাতে কোনো তারজি ছিল না।

২. শাফেয়ি মাযহাব:

শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব মতে, আযানে তারজি সুন্নাত।

- **দলিল:** হযরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিস। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আযান শিক্ষা দেওয়ার সময় তারজি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আবু মাহজুরা (রা.)-এর আমলের ব্যাখ্যা (হানাফি জবাব):

হানাফি ফকিহগণ বলেন, আবু মাহজুরা (রা.) যে তারজি করেছেন বা রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে যা শিখিয়েছেন, তা ছিল 'তা'লিম' বা শিক্ষার জন্য। আবু মাহজুরা (রা.) নতুন মুসলমান ছিলেন, তাই নবীজি (সা.) তাঁকে বাক্যগুলো মুখস্থ করানোর জন্য প্রথমে আস্তে এবং পরে জোরে বলিয়েছিলেন। এটি আযানের মূল অংশ হিসেবে ছিল না।

যদি তারজি আযানের স্থায়ী অংশ হতো, তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান মুয়াজ্জিন বিলাল (রা.) মদিনায় তা অবশ্যই আমল করতেন। যেহেতু তিনি তা করেননি, তাই বোঝা যায় আবু মাহজুরা (রা.)-এর ঘটনাটি ছিল একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাদানের ঘটনা, সর্বজনীন আমল নয়।

---

৩. আযান ও ইকামতের শব্দের সংখ্যা নিয়ে কী মতভেদ আছে? ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য মতটি বর্ণনা করো। (ما الاختلاف في عدد كلمات الاذان والاقامة؟ بين القول الراجح عند الامام ابي جعفر الطحاوي)

উত্তর:

আযান ও ইকামতের বাক্য সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. হানাফি মাযহাব:

- **আযান:** ১৫টি শব্দ। (তারজি নেই)।

- **ইকামত:** ১৭টি শব্দ। (আযানের মতোই ১৫টি + 'কদ কামাতিস সালাহ' ২ বার)।
- **যুক্তি:** হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান ও ইকামতে শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় (শাফ'আ) ছিল।

২. শাফেয়ি মাযহাব:

- **আযান:** ১৯টি শব্দ। (শাহাদাতাইন ৪ বার করে তারজিসহ)।
- **ইকামত:** ১১টি শব্দ। (শুরু ও শেষে তাকবির ২ বার, বাকি সব ১ বার, কদ কামাতিস সালাহ ২ বার)।
- **যুক্তি:** হযরত আনাস (রা.)-এর হাদিস "ইকামতকে বেজোড় (বিতর) করা"।

৩. মালিকি মাযহাব:

- **আযান:** ১৭টি শব্দ। (তাকবির শুরুতে ২ বার + তারজি)।
- **ইকামত:** ১০টি শব্দ। ('কদ কামাতিস সালাহ' ১ বার)।

ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য মত (আর-রাজিহ):
ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'শরহু মাআনিল আসার' ও 'মুশকিলুল আসার'-এ গভীর গবেষণার পর হানাফি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
তাঁর যুক্তিগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ:
১. বিলাল (রা.)-এর আমল: তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়, আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে বিলাল (রা.) যে আযান ও ইকামত দিতেন, তাতে ইকামতের শব্দগুলোও আযানের মতো দুইবার (জোড়ায়) ছিল। এটি একটি মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক আমল।
২. হাদিসের সমন্বয়: আনাস (রা.)-এর হাদিসে যে 'বিতর' বা বেজোড় করার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো আযানের তুলনায় ইকামতে বিরতি কম দেওয়া বা দ্রুত বলা। অথবা এটি মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে।
৩. কিয়াস: আযান যেমন মানুষকে ডাকার জন্য, ইকামতও মানুষকে দাঁড় করানোর জন্য। আযান যেহেতু জোড়ায় জোড়ায়, ইকামতও জোড়ায় জোড়ায় হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং, ইমাম তাহাবির মতে, ইকামতের বাক্য ১৭টি হওয়াই বিশুদ্ধ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ আমল।

---

৪. স্বপ্নের মাধ্যমে কি শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয়? অন্যথায় সাহাবিদের স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে আযান কীভাবে প্রবর্তিত হলো? (هل يثبت حكم الشريعة بالرؤيا ؟ والا كيف شرع الاذان بناء على رؤيا بعض الصحابة ؟)

উত্তর:

স্বপ্নের শরয়ী মর্যাদা:

ইসলামি শরীয়তের মূলনীতি (উসুল) অনুযায়ী, নবীদের স্বপ্ন ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ মানুষ, অলি-আউলিয়া বা সাহাবিদের স্বপ্ন স্বতন্ত্র শরয়ী দলিল (হুজ্জাত) নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে হালাল, হারাম বা নতুন কোনো ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। কারণ ওহি একমাত্র নবীদের কাছেই আসে, আর নবীদের স্বপ্নও ওহির অন্তর্ভুক্ত।

আযানের প্রবর্তনের ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন জাগতে পারে, আযান তো আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নের মাধ্যমে শুরু হলো, তাহলে এটি কীভাবে শরীয়ত হলো? এর উত্তর হলো: আযান শরীয়ত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে স্বপ্নের কারণে নয়, বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদনের (Taqrir) কারণে।

১. যখন আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নের কথা জানালেন, তখন নবীজি (সা.) বললেন, "এটি সত্য স্বপ্ন" এবং তিনি বিলাল (রা.)-কে সেই অনুযায়ী আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই নির্দেশ বা অনুমোদনই হলো 'ওহি' বা 'সুন্নাহ'। রাসুল (সা.) যদি চুপ থাকতেন বা নিষেধ করতেন, তবে ওই স্বপ্নের কোনো মূল্য থাকত না।

৩. এছাড়া অনেক মুহাদ্দিস বলেন, আযানের বিধান নিয়ে জিবরাইল (আ.)-ও ওহি নিয়ে এসেছিলেন। আব্দুল্লাহর স্বপ্ন ছিল কেবল একটি 'সাবাব' বা উপলক্ষ। আল্লাহ চেয়েছিলেন একজন সাহাবির মাধ্যমে এই মহৎ আমলটির সূচনা হোক।

সারকথা:
আযান স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং 'ওহিয়ে গায়রে মাতলু' বা সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে। স্বপ্নটি ছিল কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ বা ইশারা, যা রাসুলের মোহর লেগে আইনে পরিণত হয়েছে।

---

৫. আযান ও ইকামতের অর্থ কী? এবং আযান প্রবর্তনের হেকমত কী? (ما معنى الاذان والاقامة؟ وما الحكمة في مشروعية الاذان ؟)

উত্তর:
(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি আগের সেটেও ছিল, এখানে পুনরায় সংক্ষেপে ও নতুন আঙ্গিকে উত্তর দেওয়া হলো)

অর্থ:

- **আযান:** অর্থ ঘোষণা করা, উচ্চস্বরে আহ্বান জানানো। পরিভাষায়: নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শব্দাবলি দ্বারা নামাজের জন্য আহ্বান।
- **ইকামত:** অর্থ দাঁড় করানো বা প্রতিষ্ঠিত করা। পরিভাষায়: জামাত শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে মুসল্লিদের নামাজের জন্য দাঁড় করানোর ঘোষণা।

আযান প্রবর্তনের হেকমত ও তাৎপর্য:
১. তাওহিদের প্রচার: আযানের প্রতিটি বাক্যে আল্লাহর বড়ত্ব (আল্লাহু আকবার) এবং একত্ববাদের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ঘোষণা থাকে। দিনে পাঁচবার এই ঘোষণা বাতিলের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে।
২. সময়ের শৃঙ্খলা: মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনকে নামাজের সময়ের সাথে সুশৃঙ্খল করা। আযান মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কাজের ফাঁকে প্রভুর দরবারে হাজিরা দেওয়ার সময় হয়েছে।
৩. মুসলিম ঐক্যের প্রতীক: ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো ভেদাভেদ ভুলে একই সময়ে একই আওয়াজে মসজিদে সমবেত হওয়া মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক।

৪. শয়তান বিতাড়ন: হাদিসে এসেছে, আযানের আওয়াজ শুনলে শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়। অর্থাৎ আযান পরিবেশকে শয়তানের প্রভাবমুক্ত ও পবিত্র করে।

---

৬. আযানে 'তারজি' কী এবং এর হুকুম কী? (ما الترجيع في الاذان وما حكمه ؟)

উত্তর:

তারজি (الترجيع):

আভিধানিক অর্থ: ফিরিয়ে আনা বা পুনরাবৃত্তি করা।

পারিভাষিক অর্থ: মুয়াজ্জিন আযানের সময় 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ'—এই দুটি শাহাদাত বাক্য প্রথমে মনে মনে বা নিম্নস্বরে (নিজে শোনার মতো করে) বলবে, অতঃপর সেই বাক্যগুলোই পুনরায় উচ্চস্বরে মিনার বা আযানের স্থান থেকে ঘোষণা করবে। এই পদ্ধতিকেই তারজি বলা হয়।

হুকুম:

এ বিষয়ে ফকিহদের দ্বিমত রয়েছে:

১. শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব: তাদের মতে তারজি করা সুন্নাত। আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিস তাদের দলিল।

২. হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব: তাদের মতে তারজি করা সুন্নাত নয় (বরং মাকরুহ বা অপ্রয়োজনীয়)। তাদের যুক্তি হলো, আযানের মূল উদ্দেশ্য হলো 'ইলাম' বা মানুষকে জানানো। নিম্নস্বরে বললে মানুষ শুনবে না, তাই তা অনর্থক। আর বিলাল (রা.)-এর আযানে তারজি ছিল না। যদি কেউ তারজি করে, তবে আযান হয়ে যাবে, কিন্তু তা উত্তম পদ্ধতি নয়।

ফতোয়া: হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তারজি বর্জন করাই শ্রেয়, কারণ এটি মদিনার আমল বা 'আমলে মুতাওয়ারাস' এর বিরোধী।

---

৭. আযান ও ইকামতের সুন্নতসমূহ বর্ণনা করো। (بين سنن الاذان والاقامة)

উত্তর:

(এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ববর্তী সেটে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে, এখানে মূল পয়েন্টগুলো আরবি পরিভাষাসহ উল্লেখ করা হলো)

আযান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ:

১. আত-তাহারাত (الطهارة): পবিত্র অবস্থায় (ওজুসহ) আযান ও ইকামত দেওয়া।

২. আল-কিয়াম (القيام): দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া। বসে আযান দেওয়া মাকরুহ।

3. ইস্তিকবালুল কিবলা (استقبال القبلة): কিবলামুখী হওয়া।

৪. ওয়াজউল উসবুয়াইন (وضع الإصبعين): আযানের সময় দুই কানে শাহাদাত আঙুল রাখা।

৫. আত-তারতিল (الترتيل) ও আল-হদর (الحدر): আযান ধীরস্থিরভাবে (তারতিল) দেওয়া এবং ইকামত দ্রুত (হদর) দেওয়া।

৬. আল-ইলতিফাত (الالتفات): 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় যথাক্রমে ডানে ও বামে ঘাড় ফেরানো (বুক ও পা স্থির রেখে)।

৭. আল-মুওয়ালাত (الموالاة): আযান ও ইকামতের বাক্যগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, মাঝখানে অন্য কথা না বলা।

৮. জাওয়াব (الجواب): শ্রোতার জন্য আযানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব।

---

৮. রাসুলুল্লাহ (সা.) কেন বিলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার জন্য নির্ধারিত করলেন? উল্লেখ করো। (لم عين رسول الله ﷺ بلالا للتأذين؟ اذكر)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্ন শোনার পর তাঁকেই আযান দিতে বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন। এর পেছনে প্রধানত দুটি কারণ ছিল যা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে:

১. কণ্ঠস্বরের শ্রেষ্ঠত্ব:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ

অর্থ: কারণ বিলালের কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে অধিক উচ্চ এবং সুমিষ্ট (দরদি)। আযানের মূল উদ্দেশ্য হলো দূরের মানুষকে মসজিদে আহ্বান করা। যার গলার আওয়াজ যত বেশি জোরালো এবং শ্রুতিমধুর, সে এই কাজের জন্য তত বেশি উপযুক্ত। বিলাল (রা.)-এর কণ্ঠ ছিল অসাধারণ শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী।

২. দায়িত্ব বণ্টন ও সম্মান:

বিলাল (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দিকের নির্যাতিত সাহাবি। তাঁর ত্যাগ ও কুরবানি ছিল অপরিসীম। তাঁকে এই মহান দায়িত্ব দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং দাসপ্রথার অহংকারে মত্ত আরব সমাজে এই বার্তা দিয়েছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে গায়ের রঙ বা বংশ মর্যাদা নয়, বরং তাকওয়া ও যোগ্যতাই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

এছাড়া, বিলাল (রা.) সর্বদা রাসুল (সা.)-এর সাথে থাকতেন, তাই যথাসময়ে আযান দেওয়ার জন্য তিনি বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন।

---

৯. আযানের বাক্যগুলো কি জোড় (শাফ'আ) নাকি বিজোড় (বিতর) উচ্চারণ করতে হয়? মাসআলাটি যাচাই করো। (هل يتلفظ كلمات الاذان شفعا ام وترا؟ حقق المسئلة)

উত্তর:

তাহকিক বা যাচাই:

আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করার পদ্ধতি নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও জুমহুর (অধিকাংশ) ফকিহদের মতে আযান মূলত 'শাফ'আ' বা জোড় বাক্যবিশিষ্ট।

হাদিসের প্রমাণ:

আনাস (রা.)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে: " فامر بلال ان يشفع الاذان" (বিলালকে নির্দেশ দেওয়া হলো আযান জোড় করতে)। এর অর্থ হলো বাক্যগুলো দুইবার করে বলা।

যেমন:

- আল্লাহু আকবার (জোড়/৪ বার)

- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (জোড়/২ বার)
- হাইয়া আলাস সালাহ (জোড়/২ বার)

ফকিহদের বিশ্লেষণ:

- **হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি:** সকলের মতেই আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলতে হয়। শুধু শেষের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার বলতে হয়।
- **মালিকি মাযহাব:** তাঁরাও জোড় বলেন, তবে তাকবির শুরুতে ২ বার বলেন (অন্যরা ৪ বার বলেন)।

সিদ্ধান্ত:

আযান বিজোড় (বিতর) নয়, বরং শাফ'আ (জোড়)। হাদিসের নির্দেশ এবং সাহাবিদের আমল দ্বারা এটাই প্রমাণিত। আযানকে বিজোড় করা সুন্নাহ পরিপন্থী। আযানের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই বাক্যগুলো বারবার উচ্চারণ করা হয়।

---

১০. 'নাকুস' ও 'কারন' কী? এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের ঘোষণার জন্য এই দুটি কেন গ্রহণ করেননি? (ما هو الناقوس والقرن؟ ولم لم يتخذهما النبي ﷺ لاعلام الصلوات ؟)

উত্তর:

পরিচয়:

- **নাকুস (الناقوس):** এটি হলো এক ধরনের ঘণ্টা বা কাঠ। খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনার সময় জানানোর জন্য এটি বাজাত। লম্বা কাঠে বাড়ি দিয়ে আওয়াজ করা হতো।
- **কারন (القرن) বা বুক (البوق):** এটি হলো শিঙা (প্রাণীর শিং দিয়ে তৈরি বাঁশি)। ইহুদিরা তাদের উপাসনার সময় এটি ফুঁ দিত।

কেন গ্রহণ করেননি?

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের পরামর্শ সভায় এই দুটি প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণগুলো হলো:

১. তাশাব্বুহ বা বিজাতীয় সাদৃশ্য: ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইবাদতের মতো মৌলিক বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের

অনুকরণ করা ইসলামের মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

২. **মানবীয় কণ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব:** ঘণ্টা বা শিঙা হলো যন্ত্র, যার কোনো প্রাণ বা অনুভূতি নেই। পক্ষান্তরে আযান হলো মানবীয় কণ্ঠ, যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। যন্ত্রের আওয়াজের চেয়ে মানুষের কণ্ঠে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও প্রভাবশালী।

৩. **শিরকের গন্ধ:** ঘণ্টা বা শিঙা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর বিকৃত উপাসনা পদ্ধতির অংশ ছিল। তাওহিদের ধর্মে এমন কিছু রাখা উচিত নয় যা মানুষকে পুরনো ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

১১. মুয়াজ্জিনের জন্য আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া কি জায়েজ? (هل يجوز للمؤذن ان يأخذ اجرة على الاذان ؟)

উত্তর:

আযান ও ইকামতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা বেতন নেওয়া জায়েজ কি না, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. মুতাকাদ্দিমিন (পূর্ববর্তী) ফকিহদের মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ আলেমের মতে, আযান, নামাজ, কুরআন শিক্ষা—এসব ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া নাজায়েজ।

দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) উসমান বিন আবুল আস (রা.)-কে বলেছিলেন:

وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

অর্থ: তুমি এমন মুয়াজ্জিন নিয়োগ করো যে তার আযানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেয় না। (সুনানে আবু দাউদ)

২. মুতাআখখিরিন (পরবর্তী) ফকিহদের মত:

পরবর্তী যুগের ফকিহগণ এবং বর্তমান হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী, আযানের বিনিময়ে বেতন বা পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ।

কারণ (জরুরত): মানুষের মধ্যে দ্বীনি উদ্দীপনা কমে গেছে। যদি বেতন না দেওয়া হয়, তবে কেউ নিয়মিত সময়ের পাবন্দি করে আযান দেবে না। এতে মসজিদগুলো অচল হয়ে পড়বে এবং জামাত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। তাই 'দ্বীন সংরক্ষণের স্বার্থে' ফকিহগণ একে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। একে 'ইস্তিসান' বা জনকল্যাণমূলক বিধান বলা হয়।
সিদ্ধান্ত: যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনা বেতনে আযান দেয়, তবে তা সর্বোত্তম। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে বেতন নিলে তা হারাম হবে না।

---

১২. ইকামতের বাক্য বিজোড় (বিতর) করার ব্যাপারে আলেম ও ফকিহদের মতপার্থক্য কী? (ما الاختلاف بين العلماء والفقهاء في ايتار الاقامة ؟)
উত্তর:
হাদিসে হযরত আনাস (রা.) বলেছেন: "উইতিরুল ইকামা" (ইকামতকে বিজোড় করা)। এই 'বিতর' বা বিজোড় করার ব্যাখ্যা এবং ইকামতের বাক্য সংখ্যা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে।
১. শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব:
তাঁরা আনাস (রা.)-এর হাদিসটিকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, ইকামত সত্যিকিই বিজোড় হবে। অর্থাৎ বাক্যগুলো একবার করে বলতে হবে।

- আল্লাহু আকবার (শুরুতে ২ বার, শেষে ২ বার)
- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১ বার)
- আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ (১ বার)
- হাইয়া আলাস সালাহ (১ বার)
- হাইয়া আলাল ফালাহ (১ বার)
- কদ কামাতিস সালাহ (২ বার - এটি ব্যতিক্রম)
- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১ বার)

মোট ১১টি শব্দ।
২. হানাফি মাযহাব:
হানাফি মাযহাব মতে, ইকামতও আযানের মতোই জোড় (শাফ'আ) বা দুইবার করে বলতে হবে।

যুক্তি ও হাদিসের ব্যাখ্যা:

- তাঁরা বলেন, আনাস (রা.)-এর হাদিসে 'বিতর' দ্বারা সংখ্যায় ১ বোঝানো হয়নি, বরং আযানের তুলনায় ইকামতের আওয়াজ বা বিরতি কম বোঝানো হয়েছে।
- **শক্তিশালী দলিল:** সহিহ হাদিসে এসেছে, হযরত বিলাল (রা.) আজীবন ইকামত দুইবার করে (জোড়ায়) দিয়েছেন। আবু মাহজুরা (রা.)-কেও নবীজি (সা.) ইকামতের বাক্য দুইবার করে শিখিয়েছেন (নাসায়ি)।
- ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, আনাস (রা.)-এর হাদিসটি হয় মানসুখ (রহিত), অথবা এটি আযানের ৪ বার তাকবিরের তুলনায় ইকামতের ২ বার তাকবিরকে 'বিতর' বলা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

অন্য তিন মাযহাবে ইকামত একবার করে (বিতর), কিন্তু হানাফি মাযহাবে ইকামত দুইবার করে (জোড়)। উভয়টিই সুন্নাহসম্মত, তবে হানাফি দাবি হলো দুইবার বলাটাই অধিক সতর্কতামূলক এবং রাসুল (সা.)-এর শেষ আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

3- عن ابن عمر (رض) قال كان الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير انه اذا قال قد قامت الصلوة قالها مرتين لعرفنا أنها الاقامة فيتوضأ احدنا ثم يخرج –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما الاختلاف في عدد كلمات الاذان والاقامة بين - او- ما الاختلاف في عدد كلمات الاذان والاقامة؟ بين قول الامام ابي جعفر الطحاوى (رح) مدللا –

2- بين سنن الاذان والاقامة –

3- كيف يصنع المؤذن في اذانه ؟ بين موضحا –

4- ما معنى التثويب؟ وهل يجوز التثويب للصلوة بعد الاذان؟

5- هل يجب الاقامة على من اذن؟ حقق المقام –

6- اشرح قول ابن عمر(رض) فعرفنا انها الاقامة فيتوضأ احدنا –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن ابن عمر (رض) قال كان الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير انه اذا قال قد قامت الصلوة قالها مرتين لعرفنا أنها الاقامة فيتوضأ احدنا ثم يخرج.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি আযান ও ইকামতের বাক্য সংখ্যা নির্ধারণে শাফেয়ি ও অন্য মাযহাবের একটি শক্তিশালী দলিল। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৫১০), ইমাম নাসায়ি (রহ.) তাঁর সুনান, এবং ইমাম দারা কুতনি (রহ.) তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি সনদগতভাবে সহিহ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মদিনায় আযান ও ইকামতের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে আমল করতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইকামতের শব্দগুলো কেমন ছিল, তা বর্ণনা করাই এই হাদিসের প্রেক্ষাপট। বিশেষ করে

ইকামতের শব্দগুলো যে আযানের চেয়ে ভিন্ন (একবার করে), তা স্পষ্ট করার জন্য হযরত ইবনে ওমর (রা.) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সা.)-এর যুগে আযান ছিল 'দুইবার দুইবার' (বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায়) এবং ইকামত ছিল 'একবার একবার' (বাক্যগুলো এককভাবে)। তবে যখন মুয়াজ্জিন "কদ কামাতিস সালাহ" (নামাজ দাঁড়িয়ে গেছে) বলতেন, তখন তা 'দুইবার' বলতেন। (ইকামতের আওয়াজ শুনে) আমরা বুঝতে পারতাম যে এটি ইকামত, ফলে আমাদের কেউ কেউ ওজু করতেন এবং এরপর নামাজের জন্য বের হতেন।

ব্যাখ্যা:

- **দুইবার দুইবার:** আযানের বাক্যগুলো বারবার বা জোড়ায় বলা হতো।
- **একবার একবার:** ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হতো। এটি শাফেয়ি মাযহাবের দলিল। তবে হানাফি মতে, এটি আযানের তুলনায় দ্রুত বলার ইঙ্গিত অথবা এটি প্রাথমিক যুগের আমল।
- **ওজু করা:** হাদিসের শেষাংশ প্রমাণ করে যে, সাহাবিরা ইকামতের আওয়াজ শোনার পরও ওজু করার সুযোগ পেতেন, অর্থাৎ ইকামত ও জামাতের শুরুর মধ্যে সামান্য সময়ের ব্যবধান থাকত।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইকামতের শব্দগুলো সংক্ষিপ্ত ছিল। তবে "কদ কামাতিস সালাহ" দুইবার বলা হতো। সাহাবিরা ইকামতের প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. আযান ও ইকামতের বাক্য সংখ্যার মতভেদ বর্ণনা করো। এ বিষয়ে ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.)-এর অভিমত দলিলসহ উল্লেখ করো। (ما الاختلاف في عدد كلمات الاذان والاقامة؟ بين قول الامام ابي جعفر الطحاوى (رح) مدللا)

উত্তর:

আযান ও ইকামতের বাক্য সংখ্যা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। মূলত দুটি প্রধান মত এখানে পরিলক্ষিত হয়:

১. হানাফি মাযহাবের মত:

আযান ও ইকামত উভয়টিতেই বাক্যগুলো 'শাফ'আ' বা জোড়।

- আযানের বাক্য: ১৫টি।
- ইকামতের বাক্য: ১৭টি (আযানের ১৫টি + 'কদ কামাতিস সালাহ' ২ বার)।
- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাদিস এবং হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান ও ইকামত। বিলাল (রা.) আজীবন ইকামত দুইবার করেই দিয়েছেন।

২. শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবের মত:

আযানের বাক্য জোড় (তবে শাফেয়ি মতে তারজিসহ ১৯টি), কিন্তু ইকামত 'বিতর' বা বিজোড় (একবার করে)।

- ইকামতের বাক্য: ১১টি।
- **দলিল:** আলোচ্য ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদিস এবং আনাস (রা.)-এর হাদিস "ইকামতকে বিজোড় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে"।

ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর অভিমত ও তাহকিক:

ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) হানাফি মাযহাবের মতটিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'শরহু মাআনিল আসার' গ্রন্থে বলেন:

- **বিলাল (রা.)-এর আমল:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত বিলাল (রা.) যে ইকামত দিয়েছেন, তা ছিল 'দুইবার দুইবার' (জোড়ায়)। ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদিস বা আনাস (রা.)-এর হাদিসে যে 'একবার' বা 'বিজোড়' করার কথা বলা হয়েছে, তা সম্ভবত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছিল অথবা আযানের চার তাকবিরের তুলনায় ইকামতের দুই তাকবিরকে 'একবার' বলা হয়েছে।
- **আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) আবু মাহজুরা (রা.)-কে ইকামতের বাক্যগুলোও দুইবার করে (মোট ১৭টি) শিখিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ি)। এটি মক্কা বিজয়ের

পরের ঘটনা, যা ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত পদ্ধতির পরের ঘটনা হতে পারে।

- **কিয়াস বা যুক্তি:** ইমাম তাহাবি বলেন, আযান ও ইকামত—উভয়টিই নামাজের আহ্বান। আযানের উদ্দেশ্য অনুপস্থিত লোকদের ডাকা, আর ইকামতের উদ্দেশ্য উপস্থিত লোকদের দাঁড় করানো। যেহেতু উভয়টিই 'আহ্বান', তাই উভয়ের পদ্ধতি একই হওয়া উচিত। আযান যেহেতু সর্বসম্মতভাবে জোড়, তাই ইকামতও জোড় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার: ইমাম তাহাবির মতে, ইকামতের বাক্য ১৭টি হওয়াই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।

---

২. আযান ও ইকামতের সুন্নতসমূহ বর্ণনা করো। (بين سنن الاذان والاقامة)

উত্তর:

আযান ও ইকামত শুদ্ধ ও সুন্দর হওয়ার জন্য মুয়াজ্জিনের কিছু সুন্নত পালন করা জরুরি। ফকিহগণ হাদিসের আলোকে এই সুন্নতগুলো নির্ধারণ করেছেন। নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পবিত্রতা (الطهارة): আযান ও ইকামতের সময় মুয়াজ্জিনের ওজু থাকা সুন্নাত। ওজু ছাড়া আযান দেওয়া জায়েজ হলেও মাকরুহ, আর ইকামত দেওয়া আরও বেশি মাকরুহ।

২. দাঁড়িয়ে দেওয়া (القيام): আযান ও ইকামত দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত। বসে আযান দেওয়া মাকরুহ, যদি না মুয়াজ্জিন অসুস্থ হন।

৩. কিবলামুখী হওয়া (استقبال القبلة): আযান ও ইকামত দেওয়ার সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে সফরের সময় বাহনে থাকলে ভিন্ন কথা।

৪. কানে আঙুল দেওয়া (وضع الإصبعين): আযানের সময় দুই কানে শাহাদাত আঙুল রাখা সুন্নাত। এটি আওয়াজকে উচ্চ করতে সাহায্য করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিলাল (রা.)-কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইকামতের সময় কানে আঙুল দেওয়া জরুরি নয়।

৫. ডানে ও বামে ফেরা (الالتفات): 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে চেহারা ঘোরানো সুন্নাত। তবে বুক ও পা কিবলামুখীই থাকবে। এটি আযানের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ইকামতের ক্ষেত্রেও করা যায়।

৬. তারতিল ও হদর (الترتيل والحدر): আযানের বাক্যগুলো টেনে টেনে ধীরস্থিরভাবে (তারতিল) বলা সুন্নাত। আর ইকামতের বাক্যগুলো দ্রুত (হদর) বলা সুন্নাত। হাদিসে এসেছে: "যখন আযান দেবে তখন ধীরস্থিরভাবে দাও, আর যখন ইকামত দেবে তখন দ্রুত দাও।" (তিরমিজি)

৭. উঁচু স্থান: আযান উঁচু স্থানে বা মিনারে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত, যাতে আওয়াজ দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। ইকামত মসজিদের ভেতরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত।

৮. জওয়াব দেওয়া: শ্রোতার জন্য আযান ও ইকামতের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব।

---

৩. মুয়াজ্জিন কীভাবে আযান দেবেন? বিস্তারিত বুঝিয়ে বলো। (كيف يصنع المؤذن في اذانه ؟ بين موضحا)

উত্তর:

একজন মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, যা সুন্নাহ সম্মত এবং আদবপূর্ণ:

মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি:

প্রথমে মুয়াজ্জিনকে নিয়ত করতে হবে যে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মানুষকে নামাজের আহ্বান জানানোর জন্য আযান দিচ্ছেন। তাঁর ওজু থাকা বাঞ্ছনীয়।

শারীরিক অবস্থান:

তিনি মসজিদের মিনার বা উঁচু কোনো স্থানে (বর্তমানে মাইকের সামনে) দাঁড়াবেন। কিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। দুই হাতের শাহাদাত আঙুল দুই কানের ছিদ্রে স্থাপন করবেন। এটি আওয়াজকে বুলন্দ করতে সহায়তা করে।

উচ্চারণ পদ্ধতি:

১. আল্লাহু আকবার: তিনি উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলবেন। এভাবে চারবার বলবেন। প্রতি দুইবারের পর সামান্য বিরতি (Waqf) দেবেন। শ্বাস নেবেন।
২. শাহাদাতাইন: এরপর 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার বলবেন। প্রতিবারে শ্বাস নেবেন। এরপর 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' দুইবার বলবেন। (হানাফি মতে তারজি করবেন না)।
৩. আহ্বান: এরপর 'হাইয়া আলাস সালাহ' দুইবার বলবেন এবং প্রতিবার ডান দিকে মুখ ফেরাবেন। এরপর 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুইবার বলবেন এবং বাম দিকে মুখ ফেরাবেন। পা নড়বে না, শুধু ঘাড় ও মুখ ঘুরবে।
৪. ফজরের বিশেষত্ব: ফজরের আযান হলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর দুইবার 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' (ঘুম হতে নামাজ উত্তম) যোগ করবেন। একে 'তাসবিব' বলা হয়।
৫. সমাপ্তি: সবশেষে আবার 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আযান শেষ করবেন।
কণ্ঠস্বর:
আযানের সময় মুয়াজ্জিন তার সাধ্যমতো উচ্চস্বরে এবং সুমিষ্ট সুরে আযান দেবেন। তবে সুর করতে গিয়ে শব্দের বিকৃতি বা মদ্দ (টান) এর নিয়ম লঙ্ঘন করা যাবে না।

---

৪. 'তাসবিব' (التثويب) কী? আযানের পর নামাজের জন্য তাসবিব কি জায়েজ? (ما معنى التثويب؟ وهل يجوز التثويب للصلوة بعد الاذان؟)
উত্তর:
তাসবিব (التثويب)-এর অর্থ:
আভিধানিক অর্থ: ফিরে আসা বা পুনরায় ডাকা।
পারিভাষিক অর্থ: আযান দেওয়ার পর মানুষকে নামাজের জন্য পুনরায় বিশেষভাবে আহ্বান করা বা স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে 'তাসবিব' বলা হয়।
প্রকারভেদ ও হুকুম:
তাসবিব মূলত দুই প্রকার এবং এর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন:
১. ফজরের তাসবিব:

ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" বলা। এটি সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিলাল (রা.)-কে এটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। কারণ তখন মানুষ ঘুমে থাকে, তাই তাদের পুনরায় জাগানোর প্রয়োজন হয়।

২. অন্যান্য নামাজের তাসবিব (পরবর্তী যুগের ইজতিহাদ):

আযান হয়ে গেছে, কিন্তু জামাত শুরু হতে দেরি আছে বা মানুষ অলসতা করছে—এমন অবস্থায় ইকামতের আগে মানুষকে সতর্ক করার জন্য "আস-সালাহ, আস-সালাহ" বা "কামত, কামত" বলা, অথবা কাশি দেওয়া, অথবা গলা খাঁকারি দেওয়া।

- **মুতাকাদ্দিমিন (পূর্ববর্তী) আলেমদের মত:** ফজরের আযান ছাড়া অন্য কোনো সময়ে তাসবিব করা মাকরুহ বা বিদআত। কারণ সাহাবিরা এটি করেননি।
- **মুতাআখখিরিন (পরবর্তী) ফকিহদের মত (হানাফি):** পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. পরবর্তী) মানুষের অলসতা ও দ্বীনি উদাসীনতা দেখে ফতোয়া দিয়েছেন যে, মাগরিব ছাড়া অন্য ওয়াক্তে (জোহর, আসর, এশা) আযান ও ইকামতের মাঝখানে শাসক, বিচারক বা সাধারণ মানুষকে স্মরণ করানোর জন্য তাসবিব করা **জায়েজ এবং উত্তম (হাসান)**। কুফা ও অন্যান্য অঞ্চলে এটি প্রচলিত ছিল।

সিদ্ধান্ত:

বর্তমানে ইমাম বা মুয়াজ্জিন জামাত শুরুর আগে মাইকে ঘোষণা দেন "জামাত ২ মিনিট পর" বা এ জাতীয় কথা—এটিও এক ধরনের তাসবিব। দ্বীনি স্বার্থে এবং জামাত ধরার সুবিধার্থে এটি জায়েজ হিসেবে গণ্য। তবে একে আযানের মতো শরিয়তের সুনির্দিষ্ট অংশ বা সুন্নাত মনে করা যাবে না।

---

৫. যে আযান দেয়, ইকামত কি তার ওপরই ওয়াজিব? বিষয়টি তাহকিক করো। (هل يجب الاقامة على من اذن؟ حقق المقام)

উত্তর:

মূলনীতি:
ফিকহ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো: "মান আয্যানা ফাহুয়া ইউকিমু" (যে আযান দেয়, সে-ই ইকামত দেয়)। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটি কি ওয়াজিব (আবশ্যক) নাকি মুস্তাহাব (উত্তম)?
তাহকিক (বিশ্লেষণ):
১. সুন্নাহ বা মুস্তাহাব: অধিকাংশ ফকিহ এবং হানাফি মাযহাব মতে, যে ব্যক্তি আযান দিয়েছেন, ইকামত দেওয়ার হক বা অধিকার সর্বপ্রথম তাঁরই। এটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। হাদিসে এসেছে:
مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
অর্থ: যে আযান দেয়, সে-ই ইকামত দেবে। (তিরমিজি)
২. **অনুমতি সাপেক্ষে জায়েজ:** যদি মুয়াজ্জিন উপস্থিত থাকেন এবং অন্য কেউ তাঁর অনুমতি নিয়ে ইকামত দেয়, তবে তা **জায়েজ** এবং এতে কোনো দোষ নেই।
৩. **অনুমতি ছাড়া মাকরুহ:** যদি মুয়াজ্জিন উপস্থিত থাকেন এবং সুস্থ থাকেন, তবুও অন্য কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক ইকামত দেয়, তবে তা **মাকরুহ** হবে। কারণ এতে মুয়াজ্জিনের হক নষ্ট করা হয় এবং তাঁর মনে কষ্টের কারণ হতে পারে।
৪. **অনুপস্থিতিতে জায়েজ:** যদি মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে কোনো কাজে বাইরে যান এবং ফিরে আসতে দেরি হয়, তবে জামাতের সময় হয়ে গেলে অন্য যে কেউ ইকামত দিতে পারে। এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না।
ব্যতিক্রম:
যদি নির্ধারিত মুয়াজ্জিন ছাড়া অন্য কেউ (যেমন কোনো আগন্তুক) আযান দেয়, তবে ইকামত দেওয়ার অধিকার সেই আগন্তুকের চেয়ে মসজিদের নির্ধারিত ইমাম বা মুয়াজ্জিনের বেশি থাকবে। তবে সাধারণ নিয়মে যে আযান দেয়, ইকামত দেওয়ার অধিকার তারই সংরক্ষিত।

---

৬. ইবনে ওমরের উক্তি "আমরা বুঝতে পারতাম এটি ইকামত, ফলে আমাদের কেউ ওজু করত..." ব্যাখ্যা করো। ((اشرح قول ابن عمر(رض) (فعرفنا انها الاقامة فيتوضأ احدنا)

উত্তর:

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এই উক্তিটি সাহাবায়ে কেরাম ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের নামাজের প্রস্তুতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি ও ঐতিহাসিক দিক বেরিয়ে আসে:

১. আযান ও ইকামতের মাঝে সময়ের ব্যবধান:

"ফিতাওয়াজ্জাউ আহাদুনা" (অতঃপর আমাদের কেউ ওজু করত)—এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ইকামত হওয়ার সাথে সাথেই নামাজ শুরু হয়ে যেত না, বরং সামান্য কিছু সময় পাওয়া যেত। অথবা মুয়াজ্জিন যখন ইকামত শুরু করতেন, তখনো কিছু সাহাবি ওজুর প্রয়োজনে বের হতেন বা ওজুখানায় থাকতেন। এটি প্রমাণ করে যে, আযান ও ইকামতের মাঝে বা ইকামতের শুরুতে প্রস্তুতির সুযোগ ছিল।

২. সাহাবিদের সতর্কতা:

"লি-আরাফনা" (আমরা চিনতে পারতাম)—এর অর্থ হলো, ইকামতের শব্দগুলো শোনার সাথে সাথেই তাঁরা বুঝে যেতেন যে জামাত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আযানের পর থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন, কিন্তু ইকামতের আওয়াজ ছিল চূড়ান্ত সংকেত।

৩. একটি আপাত বিরোধের নিরসন:

সাধারণত নিয়ম হলো, ইকামত শুনে মসজিদে প্রবেশ করা নয়, বরং মসজিদে উপস্থিত লোকদের জন্য ইকামত দেওয়া হয়। তাহলে ইবনে ওমর (রা.) কেন বললেন যে ইকামত শুনে তাঁরা ওজু করতেন?

এর ব্যাখ্যা হলো:

- হয়তো তাঁরা মসজিদের খুব কাছেই বা মসজিদের আঙিনায় থাকতেন।
- অথবা তাঁরা নফল নামাজ বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন, ইকামত শুনে চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে ওজু নবায়ন করতেন।
- অথবা এটি এমন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যখন কেউ বিশেষ প্রয়োজনে ওজু করতে দেরি করেছেন।

৪. হুকুম:

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ইকামতের আওয়াজ শোনার পরও যদি কেউ ওজু করে দ্রুত জামাতে শরিক হতে পারে, তবে তা জায়েজ। তবে উত্তম হলো ইকামতের আগেই ওজু করে মসজিদে অবস্থান করা এবং প্রথম কাতারের ফজিলত অর্জন করা। সাহাবিদের এই আমল তাঁদের দ্বীনের প্রতি একাগ্রতা ও জামাতের প্রতি আগ্রহের প্রমাণ বহন করে।

4- حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعبني قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم قال ابن شهاب وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- تحدث عن علامات طلوع الفجر في السماء –
2- حديث الباب يدل على جواز الاكل بعد طلوع الفجر للصائم فما الجواب عنه؟
3- هل يجوز التأذين للفجر قبل طلوعه؟ بين بالايضاح – او- هل يجوز اذان الفجر قبل طلوع الفجر؟ بين اختلاف الائمة مدللا ومفصلا –
4- لم كان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل طلوع الفجر؟ او- ما الحكمة في الاذان قبل طلوع الفجر وهل هو مشروع في عصرنا هذا ؟
5- ما حكم زيادة "الصلاة خير من النوم" في اذان الفجر؟
6- تحدث موجزا عن اختلاف عدد كلمات الاذان عند الائمة –
7- اين شرع الاذان ومتى شرع؟ فصل –
8- هل يجوز الاذان قاعدا؟ بين مع اختلاف الائمة –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعبني قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم قال ابن شهاب وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ফজরের সময় নির্ধারণ এবং সেহরির শেষ সময় সম্পর্কে একটি মূলনীতিমূলক হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ৬১৭), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১০৯২) এবং ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এছাড়াও ইমাম তাহাবি (রহ.) তাঁর শরহু মাআনিল আসার গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' (বুখারি ও মুসলিম উভয়ের ঐকমত্যপূর্ণ) হিসেবে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতার স্তরে রয়েছে।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

রমজান মাসে বা নফল রোজার ক্ষেত্রে সেহরি খাওয়া কখন বন্ধ করতে হবে এবং ফজরের সঠিক সময় কখন শুরু হয়—এ নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তৎকালীন মদিনায় ফজরের আগে দুটি আযান দেওয়া হতো: একটি মানুষকে জাগানোর জন্য (বিলাল রা.-এর আযান), আরেকটি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সংকেত হিসেবে (ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর আযান)। এই দুই আযানের পার্থক্য ও হুকুম বোঝানোই হাদিসের প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইয়াযিদ ইবনে সিনান ... হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই বিলাল রাতে (ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই) আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।" বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব যুহরি (রহ.) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি। তিনি ততক্ষণ আযান দিতেন না যতক্ষণ না তাঁকে (মানুষের

পক্ষ থেকে) বলা হতো—"সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে" (অর্থাৎ সুবহে সাদিক হয়েছে)।

ব্যাখ্যা:

- **রাতের আযান:** হযরত বিলাল (রা.) সুবহে সাদিকের কিছু আগে 'সুবহে কাযিব'-এর সময় আযান দিতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাহাজ্জুদ গুজারদের বিরতি দেওয়া এবং ঘুমন্তদের সেহরির জন্য জাগানো।
- **সকাল হয়েছে:** ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) দৃষ্টিহীন ছিলেন। তিনি আকাশের অবস্থা দেখতে পেতেন না। তাই অন্য সাহাবিরা যখন সুবহে সাদিকের আলো দেখে তাঁকে জানাতেন, তখনই তিনি ফজরের আযান দিতেন।
- **পানাহার:** হাদিসটি স্পষ্ট করে যে, বিলালের আযান শুনে পানাহার বন্ধ করা যাবে না, কারণ তখনো রাত বাকি থাকে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ফজরের ওয়াক্ত নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়া বৈধ। এবং প্রয়োজনে ফজরের আগে তাহাজ্জুদ বা সেহরির জন্য মানুষকে জাগাতে সতর্কতামূলক আযান বা সংকেত দেওয়া জায়েজ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. আকাশে ফজর উদিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো। (تحدث عن علامات طلوع الفجر في السماء)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে ফজরের নামাজ এবং রোজার শুরুর সময় নির্ধারণের জন্য আকাশের অবস্থা বা 'ফজর' চেনা অত্যন্ত জরুরি। ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্র অনুযায়ী আকাশে ফজর উদিত হওয়ার দুটি পর্যায় বা লক্ষণ রয়েছে: ১. ফজর আল-কাযিব (মিথ্যা প্রভাত) এবং ২. ফজর আস-সাদিক (সত্য প্রভাত)।

ক. ফজর আল-কাযিব (الفجر الكاذب):

রাতের শেষ ভাগে পূর্ব আকাশে লম্বালম্বিভাবে (উল্লম্বভাবে) যে আলোর রেখা দেখা যায়, তাকে 'ফজর আল-কাযিব' বা মিথ্যা ফজর বলা হয়। একে

হাদিসে 'লেজে সিরহান' (ذنب السرحان) বা নেকড়ের লেজের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

- **লক্ষণ:** এই আলোটি নিচ থেকে উপরের দিকে স্তম্ভের মতো ওঠে। এর কিছুক্ষণ পরেই আকাশ আবার অন্ধকার হয়ে যায়।
- **হুকুম:** এই ফজর উদিত হলে ফজরের ওয়াক্ত হয় না এবং সেহরি খাওয়াও নিষিদ্ধ হয় না।

খ. ফজর আস-সাদিক (الفجر الصادق):

ফজর আল-কাযিবের পর পূর্ব দিগন্তে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে যে শুভ্র আলো প্রকাশিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে 'ফজর আস-সাদিক' বলা হয়।

- **লক্ষণ:** এই আলোটি দিগন্তরেখা বরাবর আড়াআড়িভাবে (অনুভূমিকভাবে) ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি আর অন্ধকারে মিলিয়ে যায় না, বরং ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে।
- হুকুম: এই ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই:

১. ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়।

২. রোজাদারদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী-মিলন হারাম হয়ে যায় (সেহরির সময় শেষ হয়)।

আরবি দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দুই ফজরের পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ

অর্থ: তোমরা পানাহার করো। উপরের দিকে ধাবমান আলোকরেখা (মিথ্যা ফজর) যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। বরং তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না লালচে আভা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে (সত্য ফজর)। (সুনানে তিরমিজি)

অতএব, আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত শুভ্র আলোকরেখাই হলো ফজরের প্রকৃত আলামত।

২. অধ্যায়ের হাদিসটি বাহ্যত ফজরের উদয়ের পরও রোজাদারের জন্য খাওয়ার বৈধতা নির্দেশ করে (কারণ অন্ধ মুয়াজ্জিনকে জানানোর পর তিনি আযান দিতেন)—এর উত্তর কী? (حديث الباب يدل على جواز الاكل بعد طلوع الفجر للصائم فما الجواب عنه؟)

উত্তর:

আপাত সমস্যা (ইশকাল):

হাদিসে বলা হয়েছে, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) অন্ধ ছিলেন এবং তাঁকে "আসবাখতা, আসবাখতা" (সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে) বলা না পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। এই কথার বাহ্যিক অর্থ হলো, সুবহে সাদিক হওয়ার পরে তাঁকে জানানো হতো, তারপর তিনি প্রস্তুতি নিতেন এবং আযান দিতেন। এই মধ্যবর্তী সময়ে (সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার পরেও) কি সাহাবিরা সেহরি খেতেন? যদি তাই হয়, তবে ফজরের পরেও খাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

সমাধান (আল-জাওয়াব):

ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ এই সংশয়ের কয়েকটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন:

১. নিকটবর্তী সময়ের ব্যবহার:

এখানে "সকাল হয়েছে" বলার অর্থ এই নয় যে সূর্য বা আলো পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। বরং এর অর্থ হলো, "সকাল হওয়ার সময় হয়ে গেছে" বা "সকাল খুব সন্নিকটে"। আরবি ভাষায় কোনো কাজ নিশ্চিতভাবে ঘটবে বুঝালে তা অতীত কাল (Mazi) দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। তাই তাঁকে ঠিক সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার মুহূর্তেই বা সামান্য আগেই জানানো হতো, যাতে আযানটি ঠিক ওয়াক্তের শুরুতে হয়।

২. আযান এবং সেহরি ত্যাগের সময় একই:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ "ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান পর্যন্ত খাও"—এর অর্থ হলো, তাঁর আযানের আওয়াজ শোনার আগ পর্যন্ত। যেহেতু তিনি সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই আযান দিতেন, তাই তাঁর আযানই ছিল শেষ সীমা। আযান শুরু হওয়ার পর আর খাওয়ার অনুমতি ছিল না।

৩. কুরআনের অকাট্য বিধান:

আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট সীমারেখা দিয়েছেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থ: আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ভোরের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

কুরআনের এই 'নস' বা বিধান অকাট্য। সুবহে সাদিক হয়ে গেলে এক মুহূর্তও খাওয়ার সুযোগ নেই। হাদিসটি কুরআনের বিরোধী নয়, বরং সাহাবিরা সুবহে সাদিক নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই আযান দিতেন এবং পানাহার ত্যাগ করতেন। অন্ধ সাহাবিকে জানানোর প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং ওয়াক্তের শুরুর সাথেই সংযুক্ত।

---

৩. ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে কি ফজরের আযান দেওয়া জায়েজ? ইমামদের মতভেদ দলিলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করো। (هل يجوز التأذين للفجر قبل طلوعه؟ بين بالايضاح)

উত্তর:

ফজরের ওয়াক্ত (সুবহে সাদিক) হওয়ার আগেই ফজরের আযান দেওয়া জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত:

তাঁদের মতে, ফজরের আযান ওয়াক্ত হওয়ার আগেও (রাতের শেষ ভাগে) দেওয়া জায়েজ এবং সুন্নাত। যদি কেউ সময়ের আগে আযান দেয়, তবে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়া জরুরি নয়।

দলিল:

আলোচ্য হাদিসটি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেয়..."। তাঁরা বলেন, হযরত বিলাল (রা.)-এর আযানটি ছিল ফজরেরই আযান, যা তিনি সময়ের আগে দিতেন। এছাড়া নবীজি (সা.) তাঁকে নিষেধ করেননি বা পুনরায় দিতে বলেননি (শাফেয়ি ব্যাখ্যা মতে)।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত:

হানাফি মাযহাব মতে, ওয়াক্ত হওয়ার আগে কোনো নামাজেরই আযান দেওয়া জায়েজ নয়। যদি কেউ ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে সুবহে সাদিকের

আগে ফজরের আযান দেয়, তবে ওয়াক্ত হওয়ার পর তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব।

হানাফিদের দলিল ও হাদিসের ব্যাখ্যা:

- **যুক্তি:** আযানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জানানো যে নামাজের সময় হয়েছে। সময়ের আগে আযান দিলে মানুষ বিভ্রান্ত হবে এবং সময়ের আগেই নামাজ পড়ে ফেলার আশঙ্কা থাকবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ

অর্থ: নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেয় তোমাদের ঘুমন্তদের জাগানোর জন্য এবং তাহাজ্জুদ গুজারদের ফিরিয়ে আনার জন্য (সেহরির দিকে)। (নাসায়ি)

- **ব্যাখ্যা:** হানাফি ফকিহগণ বলেন, হাদিসে বিলাল (রা.)-এর যে আযানের কথা বলা হয়েছে, তা ফজরের নামাজের আযান ছিল না, বরং তা ছিল সেহরি বা তাহাজ্জুদের সতর্কতামূলক আহ্বান। একারণেই পরবর্তীতে ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ওয়াক্ত হওয়ার পর আসল আযান দিতেন। যদি আগের আযানটিই যথেষ্ট হতো, তবে দ্বিতীয় আযানের প্রয়োজন ছিল না।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাবে ওয়াক্তের আগে আযান দিলে তা আদায় হবে না। তবে রমজানে মানুষকে জাগানোর জন্য সাইরেন বা সতর্কবাণী দেওয়া জায়েজ, কিন্তু তাকে 'শারয়ী আযান' বলা যাবে না।

---

৪. হযরত বিলাল (রা.) কেন ফজর উদিত হওয়ার আগেই আযান দিতেন? বর্তমান যুগে কি এই আমল প্রযোজ্য? (لم كان بلال رضي الله عنه يؤذن (قبل طلوع الفجر؟ وهل هو مشروع في عصرنا هذا ؟

উত্তর:

বিলাল (রা.)-এর আগাম আযানের হেকমত:

হযরত বিলাল (রা.)-এর সুবহে সাদিকের আগে আযান দেওয়ার পেছনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য ছিল। হাদিস শরিফে এর তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:

১. লিয়ুকিজা না-ইমাকুম (লি يوقظ نائمكم): ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো। যাতে সে উঠে সেহরি খেতে পারে এবং গোসল বা ওজন্ুর প্রয়োজন হলে তা সেরে নিতে পারে।

২. লি-ইয়ারজিয়া ক-ইমাকুম (লি يرجع قائمكم): যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ছেন, তাঁকে সতর্ক করা। অর্থাৎ তাঁকে জানানো যে, রাত শেষ হয়ে আসছে, এখন তাহাজ্জুদ শেষ করে বিতর পড়া উচিত অথবা সেহরির প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

৩. সেহরির সময় জানান দেওয়া: রোজাদারদের জন্য এটি ছিল সেহরির সময়ের সংকেত।

বর্তমান যুগে এর প্রযোজ্যতা:

বর্তমান যুগেও কি ওয়াক্তের আগে আযান দেওয়া শরীয়তসম্মত?

- **শাফেয়ি ও অন্য মাযহাবে:** হ্যাঁ, এখনো এটি সুন্নাত হিসেবে পালিত হয়। মক্কা ও মদিনার হারামাইন শরিফাইনে এখনো ফজরের আগে একটি আযান (তাহাজ্জুদের আযান) দেওয়া হয়।
- **হানাফি মাযহাবে:** হানাফি মাযহাবে যেহেতু ওয়াক্তের আগে আযান জায়েজ নেই, তাই সাধারণ মসজিদগুলোতে এটি প্রচলিত নেই। তবে রমজান মাসে বা বিশেষ প্রয়োজনে মানুষকে জাগানোর জন্য সাইরেন, মাইকিং বা গজল ব্যবহার করা হয়—যা মূলত বিলাল (রা.)-এর আযানের 'উদ্দেশ্য' (জাগানো) পূরণ করে।

পর্যালোচনা: আমাদের দেশে ঘড়ি, মোবাইল অ্যালার্ম এবং অ্যাপস থাকার কারণে মানুষের জাগার সমস্যা অনেকটাই কমে গেছে। তবুও যদি কোনো মহল্লায় 'তাহাজ্জুদের আযান' হিসেবে এটি চালু করা হয় এবং মানুষ বিভ্রান্ত না হয়, তবে তা জায়েজ হতে পারে (সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, নামাজের আযান হিসেবে নয়)। তবে হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী বিভ্রান্তি এড়াতে এটি বর্জন করাই শ্রেয়।

---

৫. ফজরের আযানে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" বৃদ্ধি করার হুকুম কী? (ما حكم زيادة "الصلاة خير من النوم" في اذان الفجر؟)

উত্তর:

ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর দুইবার "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" (ঘুম হতে নামাজ উত্তম) বলাকে পরিভাষায় 'তাসবিব' বলা হয়। এর হুকুম নিয়ে ফকিহদের মতামত নিম্নরূপ:

হুকুম:

- **জুমহুর উলামা (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):** প্রায় সকল মাযহাবের মতে ফজরের আযানে এই বাক্যটি বৃদ্ধি করা **সুন্নাত**। এটি মুস্তাহাব বা উত্তম আমল।
- **কিছু আধুনিক মত:** কেউ কেউ একে বিদআত বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত।

দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত বিলাল (রা.) এবং হযরত আবু মাহজুরা (রা.) উভয়কেই এই বাক্যটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ... قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

অর্থ: (আবু মাহজুরা বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন... নবীজি (সা.) বললেন: যদি ফজরের নামাজ হয়, তবে তুমি বলবে: আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম।

তাৎপর্য:

ফজরের সময় মানুষ গভীর ঘুমে থাকে। শয়তান মানুষের ঘাড়ে তিনটি গিট দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এই বাক্যটি মানুষের অবচেতন মনে আঘাত করে যে, ক্ষণস্থায়ী আরামের চেয়ে চিরস্থায়ী কল্যাণের (নামাজ) গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি ফজরের আযানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

---

৬. ইমামদের মতে আযানের বাক্য সংখ্যার মতভেদ সংক্ষেপে আলোচনা করো। (تحدث موجزا عن اختلاف عدد كلمات الاذان عند الائمة)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই বিষয়টি পূর্ববর্তী প্রশ্নে বিস্তারিত এসেছে, এখানে সংক্ষেপে নির্যাস দেওয়া হলো)

আযানের বাক্য সংখ্যা নিয়ে ইমামদের তিনটি প্রধান মত রয়েছে:

১. হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব:

- **বাক্য সংখ্যা:** ১৫টি।
- **পদ্ধতি:** আল্লাহু আকবার ৪ বার, বাকি সব ২ বার করে, শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার।
- **তারজি:** নেই।
- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্ন এবং হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান।

২. **শাফেয়ি মাযহাব:**

- **বাক্য সংখ্যা:** ১৯টি।
- **পদ্ধতি:** হানাফিদের মতোই, তবে শাহাদাতাইনের ৪টি বাক্য প্রথমে আস্তে এবং পরে জোরে (তারজি) বলা হয়। (১৫ + ৪ = ১৯)।
- **দলিল:** হযরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিস।

৩. **মালিকি মাযহাব:**

- **বাক্য সংখ্যা:** ১৭টি।
- **পদ্ধতি:** শুরুতে আল্লাহু আকবার ২ বার (অন্যদের মতে ৪ বার)। এবং তারজি আছে।
- **দলিল:** মদিনাবাসীর আমল (আমলে আহলে মদিনা)।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাবের ১৫ বাক্যের মতটি হযরত বিলাল (রা.)-এর আমল দ্বারা সমর্থিত, যা রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

৭. আযান কোথায় এবং কখন বিধিবদ্ধ হয়েছে? বিস্তারিত লেখ। (اين شرع الاذان ومتى شرع؟ فصل)

উত্তর:

কোথায় (স্থান):

আযান বিধিবদ্ধ হয়েছে মদিনাতুল মুনাওয়ারায়। মক্কি জীবনে কাফেরদের বাধার কারণে প্রকাশ্যে জামাত বা আযান সম্ভব ছিল না। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের পর এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

কখন (সময়):

আযান প্রবর্তনের সঠিক সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়:

১. প্রথম হিজরি: অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক (যেমন ইবনে ইসহাক, তাবারানি) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় আসার পরপরই মসজিদে নববি নির্মাণের পর ১ম হিজরিতে আযান চালু হয়। এটিই বিশুদ্ধতম মত।

২. দ্বিতীয় হিজরি: কারো কারো মতে, ২য় হিজরিতে কিবলা পরিবর্তনের সময় আযান চালু হয়।

৩. মক্কি জীবনে (মিরাজের রাতে): কেউ কেউ বলেন, মিরাজের রাতে নামাজ ফরজ হওয়ার সাথে আযানও ফরজ হয়েছিল, কিন্তু মদিনায় আসার আগে তা কার্যকর হয়নি। তবে এই মতটি দুর্বল।

প্রেক্ষাপট:

মদিনায় আসার পর সাহাবিরা নামাজের সময় অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আসতেন। এতে জামাতে অনিয়ম হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের নিয়ে মাশোয়ারা (পরামর্শ) করেন। সেখানে শিঙা, ঘণ্টা বা আগুনের প্রস্তাব নাকচ হয়। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযান দেখেন এবং ওহির মাধ্যমে তার সমর্থন আসে। এভাবেই মদিনায় আযানের সূচনা হয়।

---

৮. বসে আযান দেওয়া কি জায়েজ? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা করো। (هل يجوز الاذان قاعدا؟ بين مع اختلاف الائمة)

উত্তর:

দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত। কোনো কারণ ছাড়া বসে আযান দেওয়া মাকরুহ। তবে এর বৈধতা নিয়ে ইমামদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১. হানাফি মাযহাব:

বিনা ওজরে (সুস্থ ব্যক্তির জন্য) বসে আযান দেওয়া মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। যদি কেউ বসে আযান দেয়, তবে সেই আযান আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তা পুনরায় দেওয়া (ইয়াদাহ) মুস্তাহাব। আর যদি মুয়াজ্জিন অসুস্থ হন বা অক্ষম হন, তবে বসে আযান দেওয়া বিনা মাকরুহাতে জায়েজ।

- মুসাফির অবস্থায় বাহনের ওপর বসে আযান দেওয়া জায়েজ।

২. শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব:

বিনা কারণে বসে আযান দেওয়া মাকরুহ, তবে আযান বাতিল হবে না। অর্থাৎ আযান শুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাত তরক করার গুনাহ হবে (যদি অবহেলাবশত করে)।

৩. মালিকি মাযহাব:

সুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে আযান দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যদি কেউ বসে আযান দেয়, তবে সেই আযান বাতিল এবং তা অবশ্যই দাঁড়িয়ে পুনরায় দিতে হবে।

দলিল:

ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন:

لَا يُؤَذِّنُ قَاعِدًا

অর্থ: কেউ যেন বসে আযান না দেয়।

আযানের অর্থ ঘোষণা দেওয়া। আর বসে ঘোষণা দিলে আওয়াজ দূর পর্যন্ত পৌঁছায় না, যা আযানের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তবে হযরত আবু সায়ীদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় বসে আযান দিতেন। এটি প্রমাণ করে যে ওজরের ক্ষেত্রে এটি জায়েজ।

সারকথা: সুস্থ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াই সুন্নাহ এবং আবশ্যকীয় আদব।

5- عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنى جبرئيل عليه السلام مرتين عند باب البيت - فصلي بي الظهر حين مالت الشمس وصلي بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلي بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ... الحديث –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- اذكر معنى الصلاة لغة وشرعا، ثم هات الدلائل الفرضية الصلوات الخمس من القرآن الكريم -
او- ما معنى الصلوة لغة وشرعا؟ وما هي الادلة القرانية لفرضية الصلوة الخمس؟ اذكرها -

2- بين كيف صلى جبرئيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الغد-
او- متى واين صلى جبرئيل برسول الله ﷺ ؟ وكم صلوة ام فيها جبرئيل؟ وما هي حدود اوقات الصلوة التي بينها جبرئيل؟ بين بالتفصيل-

3- متى نزل جبرئيل؟ وماذا كانت كيفية صلوة الرسول ﷺ مع جبرئيل في اول مرة؟

4- كيف ام جبرئيل بالنبي مع أنه أدنى منه في الفضل؟ بين –
او- من يكون افضل فهو احق بالامامة - فكيف ام جبرئيل رسول الله ﷺ وهو افضل الخلائق؟

5- كيف صح اقتداء النبي ﷺ لجبرئيل واقتداء المفترض خلف المتنقل غير مشروع عند الاحناف؟

6- ما هو الاختلاف بين الائمة في اخر وقت المغرب؟ بين –

7- بين الاوقات المستحبة للصلوات الخمس مع بيان اختلاف الائمة-

8- اذكر اختلاف الفقهاء في أول وقت صلاة العصرامع ذكر أدلتهم، بين ما هو الراجح من قولهم؟

9- اذكر الوقت المستحب لأداء صلاة الفجر من حيث الدليل –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنى جبرئيل عليه السلام مرتين عند باب البيت - فصلي بي الظهر حين مالت الشمس وصلي بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلي بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ... الحديث

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

নামাজের সময়সীমা নির্ধারণে এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও মূলভিত্তি হিসেবে গণ্য হাদিস। একে 'হাদিসে ইমামতে জিবরাইল' বলা হয়। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৩৯৩), ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর সুনানে তিরমিজি (হাদিস নং ১৪৯) এবং ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'হাসান সহিহ' বা বিশুদ্ধ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মিরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের সঠিক সময় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে ওহির অপেক্ষায় ছিলেন। বিশেষ করে কোন নামাজের সময় কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয়, তা জানা জরুরি ছিল। পরদিন জিবরাইল (আ.) এসে কাবা শরীফের চত্বরে দুই দিন ধরে ইমামতি করে নবীজি (সা.)-কে নামাজের সময়গুলো হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। এই প্রেক্ষাপটেই রাসুলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: জিবরাইল (আ.) বাইতুল্লাহর (কাবা শরীফের) দরজার নিকট দুইবার (দুই দিন) আমার ইমামতি করেছেন।

প্রথম দিন তিনি আমাকে নিয়ে জোহরের নামাজ পড়লেন যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ল। আসরের নামাজ পড়লেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলো। মাগরিবের নামাজ পড়লেন যখন রোজাদার ইফতার করে (সূর্য ডোবার সাথে সাথে)। এশার নামাজ পড়লেন যখন (আকাশের) লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং ফজরের নামাজ পড়লেন যখন রোজাদারের ওপর পানাহার হারাম হয়ে যায় (সুবহে সাদিক উদিত হলো)... [হাদিসের বাকি অংশে দ্বিতীয় দিনের বর্ণনা রয়েছে]।

ব্যাখ্যা:

হাদিসে "দুইবার" বা "দুই দিন" ইমামতি করার কথা বলা হয়েছে।

- **প্রথম দিন:** জিবরাইল (আ.) প্রতিটি নামাজের 'আউয়াল ওয়াক্ত' বা শুরুর সময়ে নামাজ পড়িয়েছেন।
- দ্বিতীয় দিন: তিনি প্রতিটি নামাজের 'আখের ওয়াক্ত' বা শেষ সময়ে নামাজ পড়িয়েছেন (যেমন—দ্বিতীয় দিন তিনি জোহর পড়ান যখন ছায়া বস্তুর সমপরিমাণ হয়, আসর পড়ান যখন ছায়া বস্তুর দ্বিগুণ হয়)।

শেষে জিবরাইল (আ.) বলেন: "হে মুহাম্মদ! নামাজের সময় হলো এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়।"

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শুরু ও শেষ সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাজের সময়সীমা আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত, এটি মানুষের ইজতিহাদ বা গবেষণা লব্ধ বিষয় নয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. নামাজের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআনুল কারিম থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার দলিলগুলো উল্লেখ করো। (ما معنى الصلوة لغة وشرعا؟ وما هي الادلة القرانية لفرضية الصلوة الخمس؟ اذكرها)

উত্তর:

ক. নামাজের অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** সালাত (الصلاة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—দোয়া বা প্রার্থনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা (ইস্তিগফার), এবং রহমত কামনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"ওয়া সাল্লি আলাইহিম"* অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া করুন।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে, নির্দিষ্ট কিছু আরকান ও আহকাম (রুকু, সিজদা, কিয়াম ইত্যাদি) পালন করে, 'তাকবিরে তাহরিমা' দ্বারা শুরু করা এবং 'সালাম' দ্বারা শেষ করা ইবাদতকে সালাত বা নামাজ বলা হয়। ফকিহগণ বলেন:

هِيَ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

খ. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার কুরআনি দলিল:

পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু আয়াত সরাসরি পাঁচ ওয়াক্ত বা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. নামাজ সময়ের সাথে নির্ধারিত:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা: ১০৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নামাজ ইচ্ছেমতো সময়ে পড়া যাবে না, বরং এর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

২. পাঁচ ওয়াক্তের ইঙ্গিতবাহী আয়াত:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

অর্থ: আপনি নামাজ কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন পাঠ (নামাজ) কায়েম করুন। (সূরা বনি ইসরাইল: ৭৮)

মুফাসসিরিনে কেরামের মতে, এই আয়াতে 'দিলুকিস শামস' দ্বারা জোহর ও আসর, 'গাসাকিল লাইল' দ্বারা মাগরিব ও এশা এবং 'কুরআনাল ফজর' দ্বারা

ফজরের নামাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে একত্রে পাঁচ ওয়াক্তের কথা এসেছে।

৩. তাসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণার আয়াত:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

অর্থ: অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও সকালে... এবং অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে। (সূরা রুম: ১৭-১৮)

এখানে 'তুমসুন' (সন্ধ্যা) দ্বারা মাগরিব ও এশা, 'তুসবিহুন' (সকাল) দ্বারা ফজর, 'আশিয়্যান' দ্বারা আসর এবং 'তুঝিরুন' দ্বারা জোহরের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে।

এই আয়াতগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুমিনদের ওপর ফরজ।

---

২. পরদিন (দ্বিতীয় দিন) জিবরাইল (আ.) কীভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেন? অথবা- জিবরাইল (আ.) কখন এবং কোথায় ইমামতি করলেন? নামাজের সীমানা নির্ধারণে তিনি কী করলেন? বিস্তারিত লেখ। (بين كيف صلى جبرئيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الغد)

উত্তর:

জিবরাইল (আ.)-এর ইমামতির ঘটনাটি দুই দিনব্যাপী ছিল। প্রথম দিন তিনি প্রতিটি নামাজের প্রারম্ভিক সময়ে (আউয়াল ওয়াক্ত) ইমামতি করেন। আর প্রশ্নে উল্লেখিত দ্বিতীয় দিন (মিনাল গাদ) তিনি প্রতিটি নামাজের শেষ সময়ে (আখের ওয়াক্ত) ইমামতি করেন, যাতে উম্মতে মুহাম্মদি নামাজের সময়সীমা বুঝতে পারে।

স্থান ও সময়:

ঘটনাটি মক্কায় কাবা শরীফের দরজার (বাবে কাবা) নিকটে ঘটেছিল। এটি মিরাজের পরদিন জোহরের ওয়াক্ত থেকে শুরু হয়।

দ্বিতীয় দিনের নামাজের বিবরণ:

হাদিসের পূর্ণাঙ্গ পাঠ ও অন্যান্য বর্ণনার আলোকে দ্বিতীয় দিনের ইমামতির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. জোহর: জিবরাইল (আ.) নবীজি (সা.)-কে নিয়ে জোহরের নামাজ তখন আদায় করলেন, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া বাদে তার সমপরিমাণ (এক গুণ) লম্বা হলো। (এটি জোহরের শেষ সময়)।

২. আসর: তিনি আসরের নামাজ তখন পড়লেন, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। (এটি আসরের শেষ সময় বা হানাফি মতে আসরের শুরুর সময়)।

৩. মাগরিব: দ্বিতীয় দিনেও তিনি মাগরিবের নামাজ ঠিক সূর্যাস্তের পরপরই আদায় করলেন (যেমন প্রথম দিন করেছিলেন)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে মাগরিবের ওয়াক্ত সংকীর্ণ, তা দেরি করা উচিত নয়। (তবে অন্য বর্ণনায় মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক পর্যন্ত থাকার কথাও এসেছে)।

৪. এশা: তিনি এশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) বা অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার সময় আদায় করলেন। এটি এশার উত্তম সময়ের শেষ সীমা।

৫. ফজর: তিনি ফজরের নামাজ তখন আদায় করলেন, যখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে (ইসফার), কিন্তু সূর্য ওঠেনি।

সীমারেখা নির্ধারণ:

দ্বিতীয় দিনের নামাজ শেষ করে জিবরাইল (আ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন:

يَا مُحَمَّدُ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

অর্থ: হে মুহাম্মদ! এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো (আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য) নামাজের সময়।

তাৎপর্য:

এই বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাজের জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত (Point of time) ফরজ নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট পরিসর (Duration) রয়েছে। প্রথম দিনের সময় হলো শুরুর সীমা এবং দ্বিতীয় দিনের সময় হলো শেষ সীমা। তবে ওয়াক্ত পার হয়ে গেলে নামাজ কাজা হয়ে যায়।

৩. জিবরাইল (আ.) কখন অবতীর্ণ হন? এবং প্রথমবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজ আদায়ের পদ্ধতি কেমন ছিল? (متى نزل جبرئيل؟ وماذا كانت كيفية صلوة الرسول ﷺ مع جبرئيل في اول مرة؟)

উত্তর:

জিবরাইল (আ.)-এর অবতরণের সময়:

পবিত্র মিরাজের রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পর, সেই দিনই দুপুরের সময় (জোহরের ওয়াক্তে) হযরত জিবরাইল (আ.) মক্কায় অবতীর্ণ হন। অনেকে ভুলবশত মনে করেন ফজরের সময়, কিন্তু সহিহ হাদিস অনুযায়ী নামাজের শিক্ষা জোহর দিয়ে শুরু হয়েছিল। কারণ জোহরকেই 'সালাতুল উলা' বা প্রথম নামাজ বলা হয়।

প্রথমবার নামাজের পদ্ধতি:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জিবরাইল (আ.)-এর প্রথম জামাতের পদ্ধতিটি ছিল শিক্ষামূলক এবং ঐতিহাসিক।

১. ইমাম ও মুক্তাদি: জিবরাইল (আ.) ইমাম হিসেবে সামনে দাঁড়ান এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর পেছনে মুক্তাদি হিসেবে দাঁড়ান। এটি ছিল জিবরাইল (আ.)-এর ইমামতিতে রাসুল (সা.)-এর নামাজ।

২. স্থান: তাঁরা কাবা শরীফের দরজার (মুলতাজিম ও দরজার মাঝখানে) কাছে দাঁড়ান।

৩. কর্মপদ্ধতি: জিবরাইল (আ.) নামাজে যা যা করছিলেন (তাকবির, রুকু, সিজদা, তাসবিহ), রাসুলুল্লাহ (সা.) তা হুবহু অনুসরণ করছিলেন।

৪. সাহাবিদের অংশগ্রহণ: কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে কিছু সাহাবিও ছিলেন। অর্থাৎ জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.)-কে শেখাচ্ছিলেন, আর রাসুল (সা.) সাহাবিদের শেখাচ্ছিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয়:

যদিও রাসুলুল্লাহ (সা.) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, তবুও তিনি জিবরাইল (আ.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছেন। এটি ছিল 'তা'লিম' বা ব্যবহারিক শিক্ষা। শিক্ষক হিসেবে জিবরাইল (আ.) ইমামতি করেছেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে,

জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষকের মর্যাদা ও অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি শিক্ষার্থী যদি মর্যাদাবানও হন।

---

৪. জিবরাইল (আ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে মর্যাদায় নিম্ন হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ইমামতি করলেন? (كيف ام جبرئيل بالنبي مع أنه أدنى منه في الفضل؟ بين)

উত্তর:

প্রশ্ন ও সংশয়:

আকিদাগতভাবে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মর্যাদা নবীজি (সা.)-এর নিচে। শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হলো—যিনি বেশি মর্যাদাবান ও জ্ঞানী, তিনিই ইমামতির অধিক হকদার। তাহলে এখানে উত্তম ব্যক্তি (মাদযুল) কীভাবে অনুত্তমের (মাফযুল) পেছনে নামাজ পড়লেন?

সমাধান ও উত্তর:

মুহাদ্দিস ও কালামবিদগণ এই প্রশ্নের চমৎকার সমাধান দিয়েছেন:

১. শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক (মাকামে তা'লিম):

এখানে ইমামতিটি সাধারণ নামাজের ইমামতি ছিল না, বরং এটি ছিল একটি 'প্রশিক্ষণ কর্মশালা'। জিবরাইল (আ.) এসেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নামাজের নিয়মাবলী ও সময় শেখাতে। শিক্ষক যখন ছাত্রকে শেখান, তখন শিক্ষককেই সামনে থাকতে হয়, যদিও ছাত্র ভবিষ্যতে শিক্ষকের চেয়ে বড় হতে পারেন। যেমন—ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর রাজাকে গাড়ি চালানো শেখানোর সময় চালকের আসনে বসেন। এটি মর্যাদার প্রশ্ন নয়, শিক্ষার প্রয়জন।

২. ফেরেশতা ও মানুষের ভিন্ন সত্তা:

জিবরাইল (আ.) ফেরেশতা এবং রাসুল (সা.) মানুষ। ফেরেশতাদের ইবাদতের ধরন মানুষের মতো নয়। এখানে জিবরাইল (আ.) মানুষের আকৃতি ধরে এসেছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে সাময়িকভাবে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩. রাসুল (সা.)-এর বিনয়:

এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিনয় ও আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ। আল্লাহ পাঠিয়েছেন জিবরাইলকে শেখানোর জন্য, তাই নবীজি (সা.) বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করেছেন।

৪. শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠা:

যদি জিবরাইল (আ.) পেছনে দাঁড়াতেন এবং মুখে বলে দিতেন, তবে 'ব্যবহারিক সুন্নাহ' প্রতিষ্ঠিত হতো না। নবীজি (সা.)-এর দেখার মাধ্যমে শেখাটা ছিল বেশি পূর্ণাঙ্গ। তাই প্রয়োজনের খাতিরে এই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

সারকথা: জিবরাইল (আ.)-এর ইমামতি ছিল সাময়িক ও শিক্ষামূলক, এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুণ্ন করে না।

---

৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য জিবরাইল (আ.)-এর ইকতেদা (অনুসরণ) কীভাবে সহিহ হলো, অথচ হানাফি মতে নফল আদায়কারীর পেছনে ফরজ আদায়কারীর নামাজ হয় না? (كيف صح اقتداء النبي ﷺ لجبرئيل واقتداء المفترض خلف المتنقل غير مشروع عند الاحناف؟)

উত্তর:

ফিকহি সমস্যা (ইশকাল):

হানাফি মাযহাবের মূলনীতি হলো: "লা ইয়াজুজু ইকতিদাউল মুফতারিয বিল মুতান্নাফিল" অর্থাৎ ফরজ নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি নফল নামাজ আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ ইমামের অবস্থা মুক্তাদির চেয়ে শক্তিশালী বা সমান হতে হয়। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজ ছিল ফরজ, কিন্তু ফেরেশতাদের ওপর শরিয়তের এই নামাজ ফরজ নয় (তাই জিবরাইলের নামাজ ছিল নফল বা শিক্ষামূলক)। তাহলে এই ইকতেদা কীভাবে বৈধ হলো?

সমাধান (আল-জাওয়াব):

হানাফি ফকিহগণ এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন:

১. তা'লিম বা শিক্ষার জন্য বিশেষ বিধান (খাসাইস):

এই ঘটনাটি ছিল শরিয়ত প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়। তখনো ইমামতির শর্তাবলী (যেমন—ইমাম ও মুক্তাদির নিয়ত এক হওয়া) পুরোপুরি নাজিল

হয়নি। এটি ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'খাসাইস', যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

২. উভয়ের নামাজই নফল ছিল:

কোনো কোনো ফকিহ বলেন, মিরাজের রাতে নামাজ ফরজ হলেও, জিবরাইল (আ.) সময় ও নিয়ম শেখানোর আগ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর তা 'আদায় করা' ফরজ হয়নি। তাই জিবরাইল (আ.)-এর সাথে পড়া নামাজগুলো নবীজি (সা.)-এর জন্যও নফল বা শিক্ষা ছিল। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি ফরজ হিসেবে আদায় শুরু করেন।

৩. ফেরেশতার নামাজ ভিন্ন প্রকৃতির:

জিবরাইল (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ইমামতি করেছেন। আল্লাহর নির্দেশে কৃত আমল নফল হতে পারে না, বরং তা ছিল তাঁর জন্য এক প্রকার দায়িত্ব বা ওয়াজিব। তাই এখানে 'দুর্বল ইমামের পেছনে সবল মুক্তাদি'—এই মূলনীতি প্রযোজ্য হয় না।

৪. হানাফি মাযহাবের বাইরের মত:

শাফেয়ি মাযহাবে নফল পড়নেওয়ালার পেছনে ফরজ পড়া জায়েজ। হতে পারে এই ঘটনায় সেই অবকাশ ছিল। তবে হানাফি মতে, এটি ছিল একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা যা সাধারণ ফিকহি মূলনীতির বাইরে।

---

৬. মাগরিবের শেষ সময় নিয়ে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা করো। (ما هو الاختلاف بين الائمة في اخر وقت المغرب؟ بين)

উত্তর:

মাগরিবের নামাজের শুরু সূর্যাস্তের সাথে সাথে—এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু শেষ সময় অর্থাৎ 'শাফাক' (গোধূলি বা লালিমা) কখন শেষ হয়, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাদিসে আছে "হিন গাবা আশ-শাফাকু" (যখন শাফাক ডুবে যায়)।

১. শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি ও ইমাম আবু ইউসুফ/মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত: তাদের মতে, 'শাফাক' বা গোধূলি হলো সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে লাল আভা (শাফাকুল আহমার) দেখা যায়। যখন এই লাল আভা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখনই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ এবং এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।

- **দলিল:** ইবনে ওমর (রা.) বলেন:

الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ

অর্থ: শাফাক হলো লাল আভা। (দারা কুতনি)

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, 'শাফাক' হলো লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার পর যে সাদা আভা (শাফাকুল আবইয়াজ) দিগন্তে অবশিষ্ট থাকে। যতক্ষণ এই সাদার রেশ থাকে, ততক্ষণ মাগরিবের সময় বাকি থাকে। যখন পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, তখন এশা শুরু হয়। এটি সাধারণত লাল আভা ডোবার প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর ঘটে।

- **দলিল:** হযরত আনাস (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত কিছু আসার এবং আরবি ভাষার প্রয়োগ। আরবীতে 'শাফাক' বলতে দিনের আলোর শেষ রেশকেও বোঝায় যা সাদাটে হয়। তিনি সতর্কতা হিসেবে ওয়াক্ত দীর্ঘ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ফতোয়া: বর্তমানে হানাফি মাযহাবেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সাহিবাইন' (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতানুযায়ী অর্থাৎ **লাল আভা** ডুবে গেলেই মাগরিব শেষ ও এশা শুরু—এই ফতোয়া দেওয়া হয়। তবে ক্যালেন্ডারে সতর্কতার জন্য ইমাম আবু হানিফার মত অনুযায়ী ১৮ ডিগ্রি বা ১৫ ডিগ্রি অনুসরণ করে সময় নির্ধারণ করা হয়।

---

৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মুস্তাহাব (উত্তম) সময়গুলো ইমামদের মতভেদসহ আলোচনা করো। (بين الاوقات المستحبة للصلوات الخمس مع بيان اختلاف الائمة)

উত্তর:

ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু ওয়াক্তের কোন অংশে (শুরু, মধ্য, না শেষ) নামাজ পড়া উত্তম বা মুস্তাহাব, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে।

১. ফজর (Morning Prayer):

- **হানাফি মাযহাব:** ফজরের নামাজ **'ইসফার'** বা আলো আলো ভাব হওয়ার সময় পড়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ অন্ধকারে শুরু করে আলো

ছড়িয়ে পড়লে শেষ করা। রাসুল (সা.) বলেছেন: *"তোমরা ফজরকে আলোকিত করো, এতে সওয়াব বেশি।"*

- **শাফেয়ি/মালিকি/হাম্বলি:** ফজরের নামাজ **'গালাস'** বা অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। রাসুল (সা.) ও সাহাবিরা প্রায়ই অন্ধকারে ফজর পড়তেন।

২. জোহর (Noon Prayer):

- **গ্রীষ্মকাল:** গরমের সময় জোহরের নামাজ কিছুটা দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। একে **'ইবরাদ'** (ঠান্ডা করা) বলা হয়।
- **শীতকাল:** শীতকালে আওয়াল ওয়াক্তে বা শুরুর দিকে পড়া মুস্তাহাব। এটি সকল মাযহাবে প্রায় স্বীকৃত।

৩. আসর (Afternoon Prayer):

- **হানাফি মাযহাব:** আসরের নামাজ কিছুটা দেরি করে পড়া মুস্তাহাব, তবে সূর্যের রঙ হলুদ হওয়ার আগেই শেষ করতে হবে। (সূর্য হলুদ হওয়া মাকরুহ ওয়াক্ত)।
- **অন্য তিন মাযহাব:** আসরের নামাজ আওয়াল ওয়াক্তে বা শুরুর দিকে পড়া মুস্তাহাব।

৪. মাগরিব (Sunset Prayer):

- **সর্বসম্মত মত:** সূর্যাস্তের পরপরই দেরি না করে মাগরিব পড়া মুস্তাহাব। বিনা কারণে মাগরিব দেরি করা মাকরুহ। তবে দুই রাকাত নফল বা আজানের জবাব দেওয়ার মতো সামান্য সময় নেওয়া জায়েজ।

৫. এশা (Night Prayer):

- **হানাফি ও হাম্বলি:** রাতের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পর্যন্ত দেরি করে এশা পড়া মুস্তাহাব। এতে জামাতে লোক বেশি হয় এবং ঘুমের আগে নামাজ শেষ কাজ হয়।
- **শাফেয়ি:** আওয়াল ওয়াক্তে পড়াই উত্তম, যদি জামাতে কষ্ট না হয়।

---

৮. আসরের নামাজের শুরুর সময় নিয়ে ফকিহদের মতভেদ দলিলসহ উল্লেখ করো। কোনটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত? (اذكر اختلاف الفقهاء في أول وقت صلاة العصرامع ذكر أدلتهم، بين ما هو الراجح من قولهم؟)

উত্তর:

আসরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়—অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়, এটি ফিকহ শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত মতভেদপূর্ণ মাসআলা।

১. জুমহুর উলামা (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ও সাহিবাইন (হানাফি):

তাঁদের মতে, আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার এক গুণ (Mithl Awwal) বা সমপরিমাণ হয় (ছায়া আসলি বাদে)।

- **দলিল:** জিবরাইল (আ.)-এর হাদিস। প্রথম দিন তিনি জোহর পড়িয়েছেন সূর্য ঢলার পর, আর আসর পড়িয়েছেন যখন ছায়া বস্তুর **সমপরিমাণ** হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:

তাঁর মতে, আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ (Mithl Thani) হয়। এর আগ পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে।

- **দলিল ১:** জিবরাইল (আ.)-এর হাদিসের দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিন তিনি জোহরের নামাজ পড়িয়েছেন যখন ছায়া বস্তুর সমপরিমাণ হয়েছে। যদি এক গুণ ছায়াতেই আসর শুরু হয়ে যেত, তবে তিনি জোহর পড়াতেন না। যেহেতু তিনি ওই সময়ে জোহর পড়েছেন, বোঝা গেল তখনো জোহর বাকি ছিল।
- **দলিল ২:** হাদিসে জোহরের নামাজকে গরম কমাতে বলা হয়েছে (ইবরাদ)। আর আরবে এক গুণ ছায়ায় গরম কমে না, দ্বিগুণ ছায়ায় কমে।

রাজিন বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত:

হানাফি মাযহাবে ফতোয়া সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর দেওয়া হয় (দ্বিগুণ ছায়া)। ভারতীয় উপমহাদেশে হানাফি মসজিদগুলোতে আসরের আজান সাধারণত দ্বিগুণ ছায়ার পরই দেওয়া হয়। তবে আরব বিশ্বে এবং অন্য মাযহাবে এক গুণ ছায়ার ওপর আমল করা হয়। সতর্কতার জন্য হানাফিদের উচিত দ্বিগুণ ছায়ার পর আসর পড়া, কিন্তু কেউ

যদি এক গুণ ছায়ার পর (অন্য মাযহাব বা সাহিবাইনের মতে) পড়ে নেয়, তবে তার নামাজ হয়ে যাবে।

---

৯. ফজরের নামাজের মুস্তাহাব সময় সম্পর্কে দলিলসহ আলোচনা করো। (اذكر الوقت المستحب لأداء صلاة الفجر من حيث الدليل)

উত্তর:

ফজরের নামাজ কি অন্ধকারে (গালাস) পড়া উত্তম, নাকি ফর্সা করে (ইসফার) পড়া উত্তম?

১. ইসফার (ফর্সা করে পড়া) - হানাফি মত:

হানাফি মাযহাবে ফজরের নামাজ শুরু করা হবে অন্ধকারে কিন্তু কেরাত ও রুকু-সিজদা শেষ করতে করতে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে যাবে। এটি মুস্তাহাব।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

অর্থ: তোমরা ফজরকে আলোকিত করে পড়ো, কারণ এতে সওয়াব সর্বাধিক। (তিরমিজি, নাসায়ি)

- **যুক্তি:** ফর্সা হলে জামাতে মুসল্লি বেশি আসতে পারে। এবং ভুল হলে সূর্য ওঠার আগে শুধরানোর সময় পাওয়া যায়।

২. গালাস (অন্ধকারে পড়া) - শাফেয়ি ও জুমহুর মত:

অন্য তিন মাযহাবে ফজরের নামাজ অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকার থাকতেই শেষ করা মুস্তাহাব।

- **দলিল:** উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ... ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

অর্থ: মুমিন নারীরা রাসুল (সা.)-এর সাথে ফজরের নামাজ পড়তেন... নামাজ শেষে যখন তারা বাড়ি ফিরতেন, অন্ধকারের কারণে কেউ তাদের চিনতে পারত না। (সহিহ বুখারি)

সমন্বয় ও সমাধান:

ইমাম তাহাবি (রহ.) উভয় মতের সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) লম্বা কেরাত পড়তেন (৬০-১০০ আয়াত)। তিনি অন্ধকারে শুরু করতেন এবং শেষ করতে করতে ফর্সা হয়ে যেত। তাই হানাফিদের মতে 'ইসফার' মানে হলো শেষ করার সময় ফর্সা হওয়া, আর শাফেয়িদের মতে 'গালাস' মানে হলো শুরুর সময় অন্ধকার থাকা। কার্যত উভয় দলিলের ওপর আমল সম্ভব।

6- عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل نبي الله ﷺ عن وقت الصلوة فقال صل معى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان في الانسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فاسفر ثم صلى الظهر حين كان فى الانسان مثله لم صلى العصر حين كان في الانسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث وقال بعضهم شطر الليل -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الصلوة لغة وشرعا ؟
2- اذكر الأوقات المكروهة للصلوة فريضة ونافلة والضاء موضحا –
3- ما هو وجه فساد الصبح بالطلوع وعدم فساد العصر بالغروب ؟
4- ما هو حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس او ادرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ بين بالتفصيل -
5- هل الاسفار بالفجر افضل ام التغليس فيه؟
6- ما هو الفى الاصلي؟ بين مقداره –
7- اذكر الأمور المفروضة في الصلاة مع ادلتها من القرآن الكريم –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل نبي الله ﷺ عن وقت الصلوة فقال صل معى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان في الانسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فاسفر ثم صلى الظهر

حين كان فى الانسان مثله لم صلى العصر حين كان في الانسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث وقال بعضهم شطر الليل.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি নামাজের সময়সীমা নির্ধারণে জিবরাইল (আ.)-এর হাদিসের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৬১৩), ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' এবং এটি 'হাদিসে জিবরাইল'-এর ব্যবহারিক রূপ হিসেবে গণ্য।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে নামাজের সঠিক সময় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কেবল মৌখিকভাবে উত্তর না দিয়ে তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে তাঁর সাথে দুই দিন নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই বাস্তবমুখী শিক্ষাদান পদ্ধতিই হাদিসটির মূল প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আল্লাহর নবী (সা.)-কে নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, "তুমি আমার সাথে নামাজ পড়ো।"

অতঃপর (প্রথম দিন) রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজ পড়লেন যখন ভোরের আলো ফুটল (সুবহে সাদিক হলো)। জোহরের নামাজ পড়লেন যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ল। আসরের নামাজ পড়লেন যখন মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হলো। মাগরিবের নামাজ পড়লেন যখন সূর্য ডুবে গেল। এশার নামাজ পড়লেন (সন্ধ্যার) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার আগেই।

অতঃপর (দ্বিতীয় দিন) তিনি ফজরের নামাজ পড়লেন যখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেল (ইসফার)। জোহরের নামাজ পড়লেন যখন মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হলো (প্রথম দিনের আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি)। আসরের নামাজ পড়লেন যখন মানুষের ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। মাগরিবের

নামাজ পড়লেন লালিমা ডোবার পূর্বে (দেরি করে)। এবং এশার নামাজ পড়লেন—কোনো বর্ণনাকারীর মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশে, আবার কারোর মতে রাতের অর্ধাংশে।

ব্যাখ্যা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) দুই দিনে নামাজের আউয়াল ওয়াক্ত (শুরুর সময়) এবং আখের ওয়াক্ত (শেষ সময়) নিজে আমল করে দেখালেন।

- **জোহর ও আসরের সংযোগ:** দ্বিতীয় দিন জোহর শেষ করেছেন যখন ছায়া এক গুণ হয়েছে, আর আসর শুরু করেছেন যখন ছায়া দ্বিগুণ হয়েছে। এটি হানাফি মাযহাবের 'দ্বিগুণ ছায়া'র দলিলের একটি ভিত্তি।
- **ব্যবহারিক শিক্ষা:** প্রশ্নকারীকে তিনি মৌখিক উত্তরের বদলে 'আমল' বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মাধ্যমে শিখিয়েছেন, যা শিক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

৪. الحاصل (সমাপনী):

হাদিসের শেষে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, "এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাজের ওয়াক্ত।" এই হাদিস প্রমাণ করে যে, আসরের ওয়াক্ত দ্বিগুণ ছায়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং ফজর ফর্সা করে পড়া সুন্নাহসম্মত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. নামাজের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الصلوة لغة وشرعا ؟)

উত্তর:

ক. নামাজের আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'সালাত' (الصلاة) শব্দটি 'সালামুন' বা 'সালওয়ুন' ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ বহুমুখী:

১. দোয়া (الدعاء): কল্যাণ কামনা করা। আল্লাহ বলেন: "ওয়া সাল্লি আলাইহিম" (তাদের জন্য দোয়া করুন)।

২. ইস্তিগফার (الاستغفار): ক্ষমা প্রার্থনা করা। ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য 'সালাত' পাঠায়, অর্থাৎ ক্ষমা চায়।

৩. রহমত (الرحمة): আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সালাত' মানে হলো রহমত বর্ষণ করা।

৪. তাসবিহ (التسبيح): পবিত্রতা বর্ণনা করা।

খ. নামাজের পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায় নামাজ বা সালাত হলো:

هِيَ عِبَادَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، وَمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، بِنِيَّةٍ وَشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

অর্থ: এমন এক ইবাদত যা নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজের সমষ্টি, যা তাকবিরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম ফেরানোর মাধ্যমে শেষ হয়, যাতে নির্দিষ্ট নিয়ত ও শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যা: নামাজ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, বরং এটি রূহানি ও জিসমানি ইবাদতের সমন্বয়। এতে কিয়াম, রুকু, সিজদার মতো কাজের পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ ও দোয়ার মতো কথা রয়েছে। ইসলামে ইমানের পর নামাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। এটি জান্নাতের চাবি এবং মুমিনের মিরাজ স্বরূপ।

২. ফরজ, নফল এবং কাজা নামাজের জন্য মাকরুহ সময়গুলো (নিষিদ্ধ সময়) বিস্তারিত বর্ণনা করো। (اذكر الأوقات المكروهة للصلوة فريضة ونافلة والضاء موضحا)

উত্তর:

সূর্যের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে দিনে ও রাতে এমন তিনটি সময় রয়েছে যখন নামাজ পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা মাকরুহ। এই সময়গুলোকে 'আওকাতে মাকরুহাহ' বলা হয়।

তিনটি নিষিদ্ধ সময়:

১. তুলুয়ে শামস (সূর্যোদয়): সূর্য উদিত হওয়া শুরু করা থেকে পুরোপুরি উপরে ওঠা পর্যন্ত (প্রায় ১৫-২০ মিনিট)।

২. ইস্তিওয়ায়ে শামস (দ্বিপ্রহর/জাওয়াল): ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য মাথার ওপরে থাকে (সূর্য ঢলে পড়ার আগ মুহূর্ত)।

৩. গুরূবে শামস (সূর্যাস্ত): সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

এই সময়ে নামাজের হুকুম (বিস্তারিত):

- **ফরজ নামাজ:**
  - এই তিন সময়ে কোনো প্রকার ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তবে, যদি কেউ **ওই দিনের আসরের নামাজ** পড়তে ভুলে যায় বা দেরি করে ফেলে, তবে সে সূর্য ডুবন্ত অবস্থায়ও আসর পড়ে নিতে পারবে। এটি আদায় হবে, কিন্তু মাকরুহ তাহরিমি হবে। আসর ছাড়া অন্য কোনো ফরজ (যেমন ফজরের কাজা) এই সময়ে পড়া জায়েজ নেই।
- **নফল নামাজ:**
  - হানাফি মাযহাব মতে, এই তিন সময়ে যেকোনো ধরনের নফল নামাজ পড়া সম্পূর্ণ **নাজায়েজ ও মাকরুহ তাহরিমি**। এমনকি তাহিয়্যাতুল ওজু বা তাহিয়্যাতুল মসজিদও পড়া যাবে না। যদি কেউ শুরু করে, তবে তা ভেঙে দিতে হবে এবং পরে কাজা করতে হবে।

- **কাজা নামাজ (قضاء):**
  - এই তিন সময়ে অতীতের কোনো কাজা নামাজ পড়াও জায়েজ নেই।
- **জানাজা ও সিজদায়ে তিলাওয়াত:**
  - যদি জানাজা বা সিজদায়ে তিলাওয়াত এই মাকরুহ ওয়াক্তের আগেই ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে এই সময়ে তা আদায় করা মাকরুহ। কিন্তু যদি জানাজা এই সময়েই উপস্থিত হয় (যেমন সূর্য ডোবার সময় জানাজা এলো), তবে তখনই তা পড়া জায়েজ এবং মাকরুহ হবে না।

দলিল:

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا

অর্থ: তিনটি সময় এমন আছে, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নামাজ পড়তে এবং মৃতদেহ দাফন করতে নিষেধ করেছেন...। (সহিহ মুসলিম)

---

৩. সূর্য উদিত হলে ফজর নামাজ বাতিল (ফাসিদ) হয়ে যায়, কিন্তু সূর্যাস্তের সময় আসর নামাজ বাতিল হয় না—এর কারণ কী? (ما هو وجه فساد الصبح بالطلوع وعدم فساد العصر بالغروب ؟)

উত্তর:

ফিকহি মূলনীতি:

হানাফি ফিকহের একটি সূক্ষ্ম মূলনীতি হলো—"কোনো ইবাদত যদি 'কামিল' (পূর্ণাঙ্গ) কারণে ওয়াজিব হয়, তবে তা 'নাকিস' (ত্রুটিপূর্ণ) পদ্ধতিতে আদায় করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি 'নাকিস' কারণে ওয়াজিব হয়, তবে তা 'নাকিস' সময়ে আদায় করা জায়েজ।"

ফজর বাতিল হওয়ার কারণ:

ফজরের নামাজ ওয়াজিব হয়েছে সুবহে সাদিকের সময়। সুবহে সাদিক হলো একটি 'কামিল ওয়াক্ত' (পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ সময়), কারণ তখন সূর্যের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব বা অন্য ধর্মের ইবাদত (সূর্যপূজা) থাকে না।

সূর্যোদয়ের সময়টি হলো 'নাকিস ওয়াক্ত' (ত্রুটিপূর্ণ সময়), কারণ তখন শয়তান সূর্যের সাথে থাকে এবং সূর্যপূজারীরা পূজা করে।
নিয়ম হলো: ভালো জিনিসের ঋণ খারাপ জিনিস দিয়ে শোধ করা যায় না। তাই ফজরের মতো 'কামিল' নামাজ সূর্যোদয়ের মতো 'নাকিস' সময়ে আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে।
আসর বাতিল না হওয়ার কারণ:
আসরের নামাজের শেষ ওয়াক্ত হলো সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা বা অস্ত যাওয়ার সময়। আসরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ (সাবাব) হলো সময়ের শেষ অংশ। আসরের সময়ের শেষ অংশ নিজেই একটি 'নাকিস ওয়াক্ত' (কারণ সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দ্যুতি কমে গেছে)।
যেহেতু আসর ওয়াজিবই হয়েছে একটি 'নাকিস' বা ত্রুটিপূর্ণ সময়ে, তাই সেই নামাজটি সূর্যাস্তের মতো 'নাকিস' সময়ে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে (যদিও মাকরুহ)। অর্থাৎ, যেমন ঋণ, তেমন পরিশোধ।
সহজ কথা:
ফজর শুরু হয় ভালো সময়ে, তাই খারাপ সময়ে (সূর্যোদয়ে) তা চলে না। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত নিজেই দুর্বল সময়, তাই দুর্বল সময়ে (সূর্যাস্তে) তা আদায় হয়ে যায়।

---

৪. সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকাত বা সূর্যাস্তের আগে আসরের এক রাকাত পেলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত লেখ। (ما هو حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس او ادرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ بين بالتفصيل)

উত্তর:
এই মাসআলায় শাফেয়ি ও হানাফি মাযহাবের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি নামাজের এক রাকাত পেল, সে পুরো নামাজ পেল।" এই হাদিসের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন।
১. ফজরের নামাজ (সূর্যোদয়ের ক্ষেত্রে):

- **হানাফি মাযহাব:** যদি কেউ ফজরের নামাজরত অবস্থায় থাকে এবং সালাম ফেরানোর আগে সূর্যের সামান্য অংশও উদিত হয়ে যায়, তবে তার **পুরো নামাজ বাতিল (ফাসিদ)** হয়ে যাবে। তাকে সূর্য পুরোপুরি ওঠার পর ওই নামাজ কাজা করতে হবে।
    - **যুক্তি:** নামাজরত অবস্থায় সূর্যোদয় হওয়া মানে 'নাকিস' বা হারাম সময় প্রবেশ করা। নামাজ শুরু হয়েছিল সহিহ সময়ে, কিন্তু শেষ হচ্ছে বাতিল সময়ে। ভালো জিনিসের সমাপ্তি খারাপ দিয়ে হতে পারে না।
- **শাফেয়ি ও জুমহুর:** যদি এক রাকাত সূর্য ওঠার আগে পূর্ণ করতে পারে, তবে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে এবং তা কাজা হিসেবে গণ্য হবে না।

২. আসরের নামাজ (সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে):

- **হানাফি ও জুমহুর (সকলের ঐকমত্য):** যদি কেউ আসরের নামাজ পড়ছে, এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেল, তবে তার নামাজ **বাতিল হবে না, বরং আদায় হয়ে যাবে**।
    - **যুক্তি:** আসরের ক্ষেত্রে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া মানে নিষিদ্ধ সময়ে প্রবেশ করা নয়, বরং নামাজের সময় শেষ হওয়া। আর আসর নিজেই দিনের শেষ নামাজ। তাছাড়া পূর্ববর্তী প্রশ্নে আলোচিত 'নাকিস' সময়ে ওয়াজিব হওয়ার কারণে এটি মাফযোগ্য।

সারসংক্ষেপ:

হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী:

- ফজরের সময় নামাজরত অবস্থায় সূর্য উঠলে নামাজ **বাতিল**।
- আসরের সময় নামাজরত অবস্থায় সূর্য ডুবলে নামাজ **সহিহ বা আদায়**।

---

৫. ফজরের নামাজ কি 'ইসফার' (ফর্সা করে) পড়া উত্তম, নাকি 'তাগলিস' (অন্ধকারে) পড়া উত্তম? (هل الاسفار بالفجر افضل ام التغليس فيه؟)

উত্তর:

ফজরের নামাজের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে দুটি প্রধান মত রয়েছে: ইসফার (আলোকিত করা) এবং তাগলিস (অন্ধকার রাখা)।

১. হানাফি মাযহাব (ইসফার উত্তম):

হানাফি মাযহাব মতে, ফজরের নামাজ অন্ধকারে শুরু করা এবং কেরাত দীর্ঘ করে এমনভাবে শেষ করা উত্তম যাতে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে যায়। একে 'ইসফার' বলা হয়।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

অর্থ: তোমরা ফজরকে আলোকিত করো (ফর্সা করে পড়ো), কারণ এতে সওয়াব সর্বাধিক। (তিরমিজি)

- **হেকমত:** ফর্সা হলে মুসল্লিদের জামাতে আসতে সুবিধা হয়, জামাত বড় হয় এবং নামাজে ভুল হলে সূর্য ওঠার আগেই তা শোধরানোর সময় পাওয়া যায়।

২. শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব (তাগলিস উত্তম):

এই তিন মাযহাবের মতে, ফজরের নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেই শেষ করা উত্তম। একে 'তাগলিস' বলা হয়।

- **দলিল:** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন:

মুমিন নারীরা রাসুল (সা.)-এর সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজর পড়তেন এবং নামাজ শেষে যখন ফিরতেন, তখন অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না। (বুখারি ও মুসলিম)

সমন্বয় ও সমাধান:

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ হলো দীর্ঘ কেরাত পড়া (৬০ থেকে ১০০ আয়াত)। তিনি অন্ধকারে শুরু করতেন এবং দীর্ঘ কেরাতের কারণে শেষ করতে করতে ফর্সা হয়ে যেত। তাই হানাফিদের 'ইসফার' মানে হলো শেষ করার সময় ফর্সা হওয়া, আর

শাফেয়িদের 'তাগলিস' মানে হলো শুরুর সময় অন্ধকার থাকা। কার্যত হানাফি পদ্ধতি অনুসরণ করলে উভয় হাদিসের ওপর আমল হয়।

---

৬. 'ফায় আসলি' (মূল ছায়া) কী? এর পরিমাণ কতটুকু? (ما هو الفئ الاصلي؟ بين مقداره)

উত্তর:

'ফায় আসলি' (الفيء الأصلي)-এর পরিচয়:

'ফায়' অর্থ ছায়া, আর 'আসলি' অর্থ মূল বা আসল। সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে (মধ্য গগনে) থাকে, তখন তাকে 'ইস্তিওয়া' বা 'জাওয়াল' বলে। ঠিক ওই মুহূর্তে প্রতিটি বস্তুর যে নূন্যতম ছায়া মাটিতে অবশিষ্ট থাকে, তাকে 'ফায় আসলি' বা 'ফায় জাওয়াল' বলা হয়।

এর পরিমাণ (মিকদার):

'ফায় আসলি'-এর কোনো নির্দিষ্ট বা স্থির পরিমাণ নেই। এটি স্থান, কাল এবং ঋতুভেদে ভিন্ন হয়।

১. বিষুব রেখায়: কিছু নির্দিষ্ট দিনে নিরক্ষীয় অঞ্চলে (Equator) দুপুরে সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে, তখন বস্তুর কোনো ছায়াই থাকে না। তখন ফায় আসলি = ০ (শূন্য)।

২. অন্যান্য স্থানে: পৃথিবীর অন্যত্র দুপুরের সময়ও সূর্যের কিছুটা হেলানো অবস্থানের কারণে বস্তুর সামান্য ছায়া থাকে। শীতকালে এই ছায়া লম্বা হয় এবং গ্রীষ্মকালে ছোট হয়।

ব্যবহার:

জোহর এবং আসরের ওয়াক্ত নির্ধারণে 'ফায় আসলি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **জোহর শুরু:** ফায় আসলি থেকে ছায়া যখন বাড়তে শুরু করে (সূর্য ঢলে পড়ে)।
- **আসর শুরু (হানাফি):** বস্তুর মূল দৈর্ঘ্য + ফায় আসলি + বস্তুর মূল দৈর্ঘ্য (দ্বিগুণ) = আসরের শুরু।
- আসর শুরু (শাফেয়ি): বস্তুর মূল দৈর্ঘ্য + ফায় আসলি = আসরের শুরু।

অর্থাৎ, নামাজের ওয়াক্ত মাপার সময় দুপুরের ওই অবশিষ্ট ছায়াটুকুকে বাদ দিয়ে হিসাব করতে হয়।

---

৭. নামাজের ফরজসমূহ (আরকান) কুরআনের দলিলসহ উল্লেখ করো। (اذكر الأمور المفروضة في الصلاة مع ادلتها من القرآن الكريم)

উত্তর:

নামাজের ভেতরে এবং বাইরে মোট ১৩টি বা ১৪টি ফরজ রয়েছে। এর মধ্যে নামাজের ভেতরের ফরজগুলোকে 'আরকান' বলা হয়। কুরআনের দলিলের আলোকে নামাজের ভেতরের ফরজগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. তাকবিরে তাহরিমা (শুরুর তাকবির):

নামাজ 'আল্লাহু আকবার' বলে শুরু করা ফরজ।

- **দলিল:** আল্লাহ বলেন:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

অর্থ: এবং আপনার রবের বড়ত্ব ঘোষণা করুন (তাকবির বলুন)। (সূরা মুদ্দাসসির: ৩)

২. কিয়াম (দাঁড়ানো):

সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ।

- **দলিল:**

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা: ২৩৮)

৩. কিরাত (কুরআন তিলাওয়াত):

নামাজে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরজ।

- **দলিল:**

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

অর্থ: অতএব, কুরআন থেকে যা সহজ হয়, তা পাঠ করো। (সূরা মুজ্জাম্মিল: ২০)

৪. রুকু (মাথা নত করা):

নির্দিষ্ট নিয়মে রুকু করা ফরজ।

- **দলিল:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো। (সূরা হজ: ৭৭)

৫. সিজদা (মাটিতে কপাল রাখা):

উভয় সিজদা করা ফরজ।

- **দলিল:**

وَاسْجُدُوا

অর্থ: এবং তোমরা সিজদা করো। (সূরা হজ: ৭৭)

৬. কাদায়ে আখিরা (শেষ বৈঠক):

নামাজের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসে থাকা ফরজ। যদিও এর সরাসরি আয়াত নেই, তবে হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, "যখন তুমি মাথা উঠালে এবং বসলে, তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হলো।" এবং কুরআনের নির্দেশ "নামাজ শেষ করো" পালনের জন্য শেষ বৈঠক অপরিহার্য।

৭. খুরুজ বি-সুনয়িহি (সালাম ফিরানো):

নিজের ইচ্ছায় নামাজ থেকে বের হওয়া। এটি অধিকাংশের মতে ওয়াজিব, কারো মতে ফরজ।

7- عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره آنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والـمـغرب والعشاء –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَة

1- متى فرضت الصلاة، وهل كانت فرضا في الشريعة السابقة؟ بين بيانا تاما-

2- ظاهر الحديث يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين كان جمعا حقيقيا، فما قولك فيه؟ بين –

3- اذكر أول وقت صلاة الـعصر مـع اختلاف الأئمة فيه –

4- تحدث عن غزوة تبوك بالاختصار-

5- اذكر اختلاف الفقهاء في نـهاية وقت صلاة المغرب -

6- ما معنى الجمع لغة واصطلاحا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتمثيل –

7- اكتب نبذة من حياة معاذ بن جبل (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره آنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والـمـغرب والعشاء.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে আদায় করা বা 'জময়ে বাইনাস সালাতাইন' সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ হাদিস। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৭০৬), ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' স্তরের।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। একে 'জাইশুল উসরাহ' বা কষ্টের বাহিনী বলা হয়। দীর্ঘ সফর, প্রচণ্ড গরম এবং জলের অভাব—এমন কঠিন পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের কষ্ট লাঘবের জন্য নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় বা রুখসাত প্রদান করেছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটেই হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু তুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তাঁরা তাবুক যুদ্ধের বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে (সফরে) বের হয়েছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা:

হাদিসে "একত্রে আদায় করতেন" (Yajma'u) কথাটি উল্লেখ আছে। এর পদ্ধতি নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

- **ইমাম শাফেয়ি ও জুমহুর:** তাঁরা মনে করেন, রাসুল (সা.) এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে এনে পড়েছেন (হয় জোহরের সময়ে আসর, না হয় আসরের সময়ে জোহর)। একে 'জমে হাকিকি' বা প্রকৃত একত্রীকরণ বলে।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মতে, রাসুল (সা.) জোহরকে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরকে ঠিক আওয়াল ওয়াক্তে পড়েছেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল দুই নামাজ একসাথে, কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি নামাজ তার নিজ নিজ সময়ে পড়া হয়েছে। একে 'জমে সুরি' বা বাহ্যিক একত্রীকরণ বলে। হানাফি মাযহাবে আরাফাত ও মুজদালিফা ছাড়া অন্য কোথাও দুই ওয়াক্ত নামাজ এক সময়ে পড়া জায়েজ নেই।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফরে নামাজের সময় ও নিয়মে শিথিলতা বা সহজীকরণ ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তবে এই 'একত্রীকরণ' কীভাবে হবে, তা ফিকহি ইজতিহাদ সাপেক্ষ বিষয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. নামাজ কখন ফরজ হয়েছে? এবং পূর্ববর্তী শরিয়তগুলোতে কি নামাজ ফরজ ছিল? বিস্তারিত আলোচনা করো। (متى فرضت الصلاة، وهل كانت فرضا في الشريعة السابقة؟ بين بيانا تاما)

উত্তর:

ক. নামাজ ফরজ হওয়ার সময়কাল:

ইসলামি শরিয়তে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছে পবিত্র মিরাজের রজনীতে। হিজরতের পূর্বে মক্কি জীবনে এই মহান ইবাদতটি উম্মতে মুহাম্মদির ওপর অপরিহার্য করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, এটি হিজরতের এক বছর বা দেড় বছর আগে ২৭শে রজব রাতে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়, পরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিয়ে ৫ ওয়াক্তে স্থির করা হয়, কিন্তু সওয়াব ৫০ ওয়াক্তেরই বহাল রাখা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ

অর্থ: তা সংখ্যায় পাঁচ, কিন্তু সওয়াবে পঞ্চাশ। (সহিহ বুখারি)

খ. পূর্ববর্তী শরিয়তে নামাজের বিধান:

নামাজ কেবল উম্মতে মুহাম্মদির বৈশিষ্ট্য নয়, বরং হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসুলের শরিয়তে নামাজের বিধান ছিল। তবে তাঁদের নামাজের রাকাত সংখ্যা, সময় এবং পদ্ধতি আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। কুরআনের আলোকে এর প্রমাণ নিচে দেওয়া হলো:

১. **হযরত ইব্রাহিম (আ.):** তিনি নিজের ও বংশধরদের জন্য নামাজের দোয়া করেছিলেন।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। (সূরা ইব্রাহিম: ৪০)

২. **হযরত ইসমাইল (আ.):**

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

অর্থ: তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। (সূরা মারিয়াম: ৫৫)

৩. **হযরত মুসা (আ.):** তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাঁকে প্রথম নির্দেশ দেন:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থ: এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো। (সূরা ত্ব-হা: ১৪)

৪. **হযরত ঈসা (আ.):** দোলনায় থাকা অবস্থায় তিনি বলেছিলেন:

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

অর্থ: তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে। (সূরা মারিয়াম: ৩১)

উপসংহার:

নামাজ হলো 'ইবাদতে কাদিমা' বা প্রাচীন ইবাদত। সকল নবীর দ্বীনেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম ছিল নামাজ। তবে পূর্ণাঙ্গ, সুশৃঙ্খল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতির নামাজ কেবল উম্মতে মুহাম্মদিকেই দান করা হয়েছে।

---

২. হাদিসের বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুই নামাজ একত্র করা ছিল 'জমে হাকিকি' (প্রকৃত একত্রীকরণ)। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? (ظاهر الحديث يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين كان جمعا حقيقيا، فما قولك فيه؟ بين)

উত্তর:

হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ও শাফেয়ি মত:

আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাবুকের সফরে জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা "একত্রে" পড়েছেন। এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ (Zahir) থেকে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.) বলেন যে, সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ। একে 'জমে হাকিকি' বা 'প্রকৃত একত্রীকরণ' বলা হয়। যেমন—জোহরের সময়েই আসর পড়ে নেওয়া (জমে তাকদিম) অথবা আসরের সময়ে জোহর পড়া (জমে তাখির)।

হানাফি মাযহাবের বক্তব্য ও জবাব:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফকিহগণ বলেন, এই হাদিসে যে 'একত্রীকরণ'-এর কথা বলা হয়েছে, তা 'জমে হাকিকি' নয়, বরং তা হলো 'জমে সুরি' (جمع صوري) বা বাহ্যিক একত্রীকরণ।

জমে সুরি কী?

এর অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ (সা.) জোহরের নামাজকে বিলম্বিত করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছেন এবং আসরের নামাজকে শুরুর ওয়াক্তে (জোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই) আদায় করেছেন। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়েছে দুটি নামাজ একসাথে পড়া হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে জোহর তার ওয়াক্তে এবং আসর তার নিজস্ব ওয়াক্তেই পড়া হয়েছে। কোনো নামাজই তার নির্ধারিত সময়ের বাইরে পড়া হয়নি।

হানাফিদের দলিল:

১. কুরআনের আয়াত: আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ। (সূরা নিসা: ১০৩)

সময়ের আগে নামাজ পড়লে তা আদায় হবে না, আর পরে পড়লে কাজা হবে। তাই এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে নেওয়া আয়াতের বিরোধী।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা:

ইবনে আব্বাস (রা.) যিনি এই হাদিসগুলোর অন্যতম বর্ণনাকারী, তিনি নিজেই এই একত্রীকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا

অর্থ: আমি রাসুল (সা.)-এর সাথে ৮ রাকাত (জোহর-আসর) এবং ৭ রাকাত (মাগরিব-এশা) একত্রে পড়েছি।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "তিনি কি জোহরকে দেরি করেছেন এবং আসরকে এগিয়ে এনেছেন?" ইবনে আব্বাস বললেন, "আমারও তাই মনে হয়।" (সহিহ মুসলিম)

৩. **আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা:** তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) সফরে জোহর দেরি করে এবং আসর জলদি করে পড়তেন।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাব মতে, আরাফাতের ময়দান (জোহর-আসর) এবং মুজদালিফা (মাগরিব-এশা) ছাড়া অন্য কোথাও দুই ওয়াক্ত নামাজ হাকিকিভাবে এক করা জায়েজ নেই। তাবুকের ঘটনায় যা হয়েছে তা ছিল 'জমে সুরি'।

---

৩. আসর নামাজের শুরুর ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ করো। (اذكر أول وقت صلاة العصر مع اختلاف الأئمة فيه)

উত্তর:

আসরের নামাজের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়, অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়—এই বিষয়টি ফিকহ শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত মতভেদপূর্ণ মাসআলা। মূলত এখানে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. জুমহুর উলামা (ইমাম মালিক, শাফেয়ি, আহমদ) ও সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.):

তাঁদের মতে, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার এক গুণ (Mithl Awwal) বা সমপরিমাণ হয় (দুপুরের মূল ছায়া বা 'ফায় জাওয়াল' বাদে), তখন থেকেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়।

- **দলিল:** জিবরাইল (আ.)-এর হাদিস (ইমামতে জিবরাইল)। হাদিসে এসেছে, জিবরাইল (আ.) প্রথম দিন আসরের নামাজ পড়িয়েছেন যখন ছায়া বস্তুর সমপরিমাণ ছিল। এটি নির্দেশ করে যে, আসরের সময় তখনই শুরু হয়।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ (Mithl Thani) হয় (ফায় জাওয়াল বাদে)। এর আগ পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে।

- **দলিল ১:** জিবরাইল (আ.)-এর হাদিসের দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিন জিবরাইল (আ.) জোহরের নামাজ পড়িয়েছেন যখন ছায়া বস্তুর সমপরিমাণ ছিল। যদি এক গুণ ছায়াতেই আসর শুরু হতো, তবে তিনি ওই সময়ে জোহর পড়াতেন না। যেহেতু তিনি ওই সময়ে জোহর পড়েছেন, বোঝা যায় তখনো জোহর বাকি ছিল।

- **দলিল ২:** রাসুলুল্লাহ (সা.) জোহরের নামাজকে 'ইবরাদ' বা ঠান্ডা করে পড়তে বলেছেন। আরব দেশে প্রচণ্ড গরমে এক গুণ ছায়ায় গরম কমে না, বরং দ্বিগুণ ছায়ায় আবহাওয়া কিছুটা সহনীয় হয়।
- **দলিল ৩:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিসে উম্মতের হায়াত ও কাজের সময়কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে কম বলা হয়েছে। যদি এক গুণ ছায়ায় আসর শুরু হয়, তবে আসরের সময় জোহরের চেয়ে দীর্ঘ হয়ে যায়, যা হাদিসের উপমার বিরোধী।

বর্তমান ফতোয়া:

হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ কিতাবে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের হানাফি ফতোয়ায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত (দ্বিগুণ ছায়া) কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে সাহিবাইনের মত অনুযায়ী এক গুণ ছায়ার পর আসর পড়লেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে, বিশেষ করে মক্কা-মদিনা বা অন্য মাযহাবের অনুসরণে জামাত ধরার প্রয়োজনে।

---

৪. তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। (تحدث عن غزوة تبوك بالاختصار)

উত্তর:

পরিচয় ও সময়কাল:

তাবুক যুদ্ধ (Ghazwa-e-Tabuk) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ অভিযান। এটি ৯ম হিজরির রজব মাসে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয়। মদিনা থেকে তাবুকের দূরত্ব ছিল প্রায় ৮০০ কিলোমিটার।

কারণ:

খবর আসে যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস আরবের উত্তরাঞ্চলে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন মদিনা আক্রমণের জন্য। এই হুমকি মোকাবিলা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) রোমানদের বিরুদ্ধে আগাম অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।

কঠিন পরিস্থিতি (জাইশুল উসরাহ):

এই যুদ্ধের সময় মদিনায় ছিল প্রচণ্ড গরম, খরার কারণে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ এবং ফলের পাকার মৌসুম হওয়ায় মানুষের মন ছিল ঘরের দিকে। অর্থের তীব্র সংকট ছিল। তাই এই বাহিনীকে 'জাইশুল উসরাহ' বা অভাবী বা সংকটপূর্ণ বাহিনী বলা হয়। সাহাবিরা অকাতরে দান করেছিলেন—আবু বকর (রা.) সর্বস্ব, ওমর (রা.) অর্ধেক এবং উসমান (রা.) বিশাল সম্পদের জোগান দিয়েছিলেন।

অভিযান ও ফলাফল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ৩০,০০০ সাহাবির এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুকে পৌঁছেন। কিন্তু মুসলিমদের এই বিশাল প্রস্তুতি ও সাহসিকতার খবর শুনে রোমান বাহিনী আর অগ্রসর হয়নি, তারা পিছু হটে যায়। ফলে কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমরা বিজয় লাভ করে।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) সেখানে ২০ দিন অবস্থান করেন।
- তিনি আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে শান্তি চুক্তি ও জিজিয়া করের চুক্তি করেন।
- এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়, যারা নানা অজুহাতে যুদ্ধে যায়নি।

গুরুত্ব:

তাবুক অভিযান ছিল আরব উপদ্বীপে মুসলিমদের আধিপত্যের চূড়ান্ত ঘোষণা এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

---

৫. মাগরিবের নামাজের শেষ সময় সম্পর্কে ফকিহদের মতভেদ উল্লেখ করো। (اذكر اختلاف الفقهاء في نهاية وقت صلاة المغرب)

উত্তর:

মাগরিবের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়, তা নির্ভর করে 'শাফাক' (الشفق) বা গোধূলির সংজ্ঞার ওপর। হাদিসে বলা হয়েছে, "মাগরিবের সময় থাকে শাফাক অস্ত যাওয়া পর্যন্ত"। এই শাফাকের রং নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ও সাহিবাইন (হানাফি):

তাঁদের মতে, 'শাফাক' হলো সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে লাল আভা (শাফাক আল-আহমার) দেখা যায়। যখন এই লাল আভা ডুবে যায়, তখনই মাগরিবের সময় শেষ এবং এশার সময় শুরু হয়।

- **দলিল:** হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত:

الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ

অর্থ: শাফাক হলো লাল আভা। (দারা কুতনি)

এই সময়টি সাধারণত সূর্যাস্তের পর ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, 'শাফাক' হলো লাল আভা ডুবে যাওয়ার পর আকাশের দিগন্তে যে সাদা আভা (শাফাক আল-আবইয়াজ) অবশিষ্ট থাকে। যতক্ষণ এই সাদার রেশ থাকে, ততক্ষণ মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে। যখন সাদা আভা ডুবে গিয়ে আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়, তখন এশা শুরু হয়।

- **দলিল:** তিনি হযরত আনাস (রা.) এবং আবু হুরায়রা (রা.)-এর কিছু মতের ওপর ভিত্তি করেন এবং আরবি ভাষায় 'শাফাক' শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, সাদা আভা থাকা পর্যন্ত দিনের রেশ থাকে। এটি লাল আভা ডোবার আরও প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর ঘটে।

সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া:

বর্তমানে হানাফি মাযহাবেও সহজতার জন্য এবং অধিকাংশ ফকিহদের মতের সাথে মিল রেখে 'সাহিবাইন'-এর মত (লাল আভা) অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ লাল আভা ডুবে গেলেই মাগরিব শেষ। তবে ক্যালেন্ডারগুলোতে সতর্কতার জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত অনুযায়ী সময়কে কিছুটা বাড়িয়ে (১৫ বা ১৮ ডিগ্রি হিসেবে) এশার সময় নির্ধারণ করা হয়।

---

৬. 'জময়ে' (একত্রীকরণ) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং এটি কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা করো। (ما معنى الجمع لغة واصطلاحا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتمثيل)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'জময়ে' (الجمع) শব্দের অর্থ হলো—একত্র করা, মিলানো, জমা করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, দুই ওয়াক্তের নামাজ (জোহর-আসর বা মাগরিব-এশা) কোনো ওজরের কারণে (যেমন সফর, বৃষ্টি, হজ) এক ওয়াক্তে বা এক সময়ে আদায় করাকে 'জময়ে' বা নামাজের একত্রীকরণ বলা হয়।

খ. প্রকারভেদ:

জময়ে বা নামাজ একত্রীকরণ প্রধানত দুই প্রকার (পদ্ধতিগত দিক থেকে) এবং সময়ের দিক থেকে আরও দুই প্রকার।

১. পদ্ধতিগত দিক থেকে:

- **জমে হাকিকি (جمع حقيقي):** এর অর্থ হলো প্রকৃত একত্রীকরণ। অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তের সময়ের ভেতরে ঢুকে পড়া। এটি শাফেয়ি ও অন্য মাযহাবে জায়েজ। হানাফি মাযহাবে শুধু হজের সময় আরাফাত ও মুজদালিফায় জায়েজ।
- **জমে সুরি (جمع صوري):** এর অর্থ হলো বাহ্যিক একত্রীকরণ। অর্থাৎ প্রথম নামাজ তার শেষ সময়ে এবং দ্বিতীয় নামাজ তার শুরুর সময়ে পড়া। দেখতে মনে হয় একসাথে, কিন্তু আসলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। হানাফি মতে সফরে এটিই করতে হয়।

২. সময়ের দিক থেকে (জমে হাকিকি আবার দুই প্রকার):

- **জমে তাকদিম (جمع تقديم):** অর্থাৎ 'আগাম একত্রীকরণ'। দ্বিতীয় নামাজকে এগিয়ে এনে প্রথম নামাজের সময়ে পড়া।
    - *উদাহরণ:* আরাফাতের ময়দানে জোহরের সময়েই আসর পড়া। অথবা শাফেয়ি মতে সফরে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর উভয়টি পড়া।
- **জমে তাখির (جمع تأخير):** অর্থাৎ 'বিলম্বিত একত্রীকরণ'। প্রথম নামাজকে পিছিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় নামাজের সময়ে পড়া।

- *উদাহরণ:* মুজদালিফায় মাগরিব না পড়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া। অথবা শাফেয়ি মতে সফরে আসরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর পড়া।

হানাফি অবস্থান: হানাফিরা কেবল আরাফাতে 'জমে তাকদিম' (জোহর-আসর) এবং মুজদালিফায় 'জমে তাখির' (মাগরিব-এশা) স্বীকার করেন। অন্য কোথাও হাকিকি জময়ে জায়েজ নেই।

---

৭. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة معاذ بن جبل (رض)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম মুয়াজ, উপনাম আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম জাবাল। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তিনি ছিলেন সুদর্শন, ফর্সা এবং উজ্জ্বল চোখের অধিকারী।

ইসলাম গ্রহণ:

হিজরতের পূর্বে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি আকাবার ২য় শপথে অংশগ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনায় ইসলাম প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন এবং নিজের এলাকার প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলেন।

জ্ঞান ও মর্যাদা:

তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম বড় ফকিহ ও আলেম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

অর্থ: আমার উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন মুয়াজ বিন জাবাল। (তিরমিজি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'ইমামুল উলামা' বা আলেমদের নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাহাবিরা কোনো জটিল ফতোয়ার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

দায়িত্ব পালন:

মক্কা বিজয়ের পর নবীজি (সা.) তাঁকে মক্কাবাসীদের দ্বীন শেখানোর জন্য মক্কায় রেখে যান। ৯ম হিজরিতে রাসুল (সা.) তাঁকে ইয়েমেনের বিচারক (কাজি) ও শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। বিদায় দেওয়ার সময় রাসুল (সা.) তাঁর বাহনের সাথে হেঁটেছিলেন, যা তাঁর প্রতি নবীজির গভীর ভালোবাসার প্রমাণ।

ইন্তেকাল:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি সিরিয়ায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ১৮ হিজরিতে জর্ডানের আমওয়াস নামক স্থানে প্লেগ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩ বা ৩৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জর্ডানে দাফন করা হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

8- عن ابن عباس (رض) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر –
عن ابي الزبير فذكر باسناده مثله قلت ما حمله على ذلك قال اراد ان لا يحرج امته –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما حكم الجمع بين الصلاتين؟ اذكر اقوال العلماء فيه-
2- كم قسما للجمع؟ بين كل قسم مع التمثيل –
3- ما الجمع؟ اوضح انواع الجمع بين الصلاتين-
4- قوله عليه السلام "اراد أن لا يحرج امته" يعارض قوله تعالى "أن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" فكيف التطبيق بينهما ؟
5- اذكر المواضع التي يجوز فيها الجمع الحقيقى بين الصلاتين بالادلة-
6- اكتب نبذة من حياة ابن عباس (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن ابن عباس (رض) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر –
عن ابي الزبير فذكر باسناده مثله قلت ما حمله على ذلك قال اراد ان لا يحرج امته.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি নামাজ একত্রীকরণ বা 'জময়ে বাইনাস সালাতাইন' বিষয়ে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এবং আহলে হাদিসগণের অন্যতম প্রধান দলিল। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৭০৫), ইমাম আবু

দাউদ (রহ.) এবং ইমাম তিরমিজি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' এবং সনদের দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

সাধারণত সফর বা ভীতির কারণে নামাজ একত্র করার বিধান প্রসিদ্ধ। কিন্তু মদিনায় অবস্থানকালে কোনো ভয়-ভীতি বা সফর ছাড়াই রাসুলুল্লাহ (সা.) জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে পড়েছিলেন। কেন তিনি এমনটি করেছিলেন—এই কৌতূহল দূর করতেই হাদিসের শেষাংশে কারণ দর্শানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর উম্মতের ওপর থেকে সংকীর্ণতা বা কষ্ট (হারাজ) দূর করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে মুকিম অবস্থায়ও যে এর অবকাশ আছে, তা বোঝানোই এর প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে জোহর ও আসর একত্রে আদায় করেছেন এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন—অথচ তখন কোনো ভয়-ভীতি ছিল না এবং তিনি সফরেও ছিলেন না।

(অপর বর্ণনায়) আবু জুবায়ের (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি (ইবনে আব্বাস বা সাঈদ বিন জুবায়েরকে) জিজ্ঞেস করলাম, "তিনি (রাসুল সা.) কেন এমনটি করলেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর উম্মত কোনো প্রকার কষ্টে বা সংকীর্ণতায় পতিত না হয়।"

ব্যাখ্যা:

- **ভয় ও সফর ছাড়া:** এর দ্বারা বোঝা যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় মদিনায় থাকাকালীন তিনি এই আমল করেছেন।
- **উম্মতের কষ্ট লাঘব:** উম্মত যেন মনে না করে যে ওয়াক্তের সামান্য এদিক-সেদিক হলেই দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অসুস্থতা, প্রবল বৃষ্টি বা বিশেষ কোনো কাজ বা ওজরের কারণে নামাজের সময় মেলানো যেতে পারে—এই রুখসাত বা ছাড় দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তবে হানাফি মতে, এটি ছিল 'জমে সুরি' (বাহ্যিক একত্রীকরণ), সময়ের পরিবর্তন নয়।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি সহজ ধর্ম। উম্মতের প্রয়োজন ও কষ্টের কথা বিবেচনা করে শরিয়ত নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। তবে এটিকে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র করার (জময়ে বাইনাস সালাতাইন) হুকুম কী? এ ব্যাপারে আলেমদের মতামত উল্লেখ করো। (ما حكم الجمع بين الصلاتين؟ اذكر اقوال العلماء فيه)

উত্তর:

দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে আদায় করাকে ফিকহের পরিভাষায় 'জময়ে বাইনাস সালাতাইন' বলা হয়। এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:

হানাফি মাযহাব মতে, আরাফাত ও মুজদালিফা—এই দুটি স্থান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বা স্থানে দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে আদায় করা (জমে হাকিকি) জায়েজ নেই। সফর, বৃষ্টি বা অসুস্থতা—কোনো অজুহাতই সময়ের পরিবর্তনকে বৈধ করে না।

- **দলিল:** পবিত্র কুরআনের আয়াত:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ। (সূরা নিসা: ১০৩)

যেহেতু সময় নির্দিষ্ট, তাই জোহরের নামাজ আসরের ওয়াক্তে বা আসরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে পড়া কুরআনের আয়াতের খেলাফ। হানাফি মতে, হাদিসে যে একত্রীকরণের কথা এসেছে, তা হলো 'জমে সুরি' (প্রথম নামাজ শেষ ওয়াক্তে ও পরের নামাজ শুরুর ওয়াক্তে পড়া)।

২. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মত:

জুমহুর ফকিহদের মতে, আরাফাত ও মুজদালিফা ছাড়াও বিশেষ কারণে সফর এবং বৃষ্টির সময় দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া (জমে হাকিকি) জায়েজ।

- **ইমাম শাফেয়িঃ** সফর এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে জমে তাকদিম ও জমে তাখির উভয়টি জায়েজ।
- **ইমাম মালিকঃ** সফর, বৃষ্টি এবং অন্ধকারের কারণে জায়েজ। অসুস্থতার কারণেও জায়েজ মনে করেন।
- **ইমাম আহমদঃ** সফর, রোগ, স্তন্যদানকারী মা, এবং ইস্তিহাজাগ্রস্ত নারীর জন্যও তিনি একত্রীকরণ জায়েজ মনে করেন। তাঁদের মতে আলোচ্য ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি এর প্রমাণ।

সামঞ্জস্য বিধান:

হানাফি ফকিহগণ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসে "ভয় ও সফর ছাড়া" কথাটি প্রমাণ করে যে, এটি বিশেষ কোনো পরিস্থিতির জন্য ছিল, কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই নামাজ একত্র করল, সে কবিরা গুনাহের একটি দরজায় প্রবেশ করল।" (তিরমিজি)। তাই হানাফি মতটি অধিক সতর্কতামূলক।

---

২. 'জময়ে' (একত্রীকরণ) কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রতিটি প্রকার বর্ণনা করো। (كم قسما للجمع؟ بين كل قسم مع التمثيل)

উত্তর:

নামাজ একত্রীকরণ বা 'জময়ে' প্রধানত দুই প্রকার। এর পদ্ধতি ও স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন।

১. জমে হাকিকি (الجمع الحقيقي):

এর অর্থ হলো 'প্রকৃত একত্রীকরণ'। অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত নামাজের সময় পরিবর্তন করে এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে নিয়ে পড়া। এটি আবার দুই প্রকার:

- **ক. জমে তাকদিম (جمع تقديم):** দ্বিতীয় নামাজকে এগিয়ে এনে প্রথম নামাজের সময়ে পড়া।

- *উদাহরণ:* আরাফাতের ময়দানে জোহরের সময়ে জোহর ও আসর উভয় নামাজ আদায় করা। অথবা শাফেয়ি মতে সফরে জোহরের ওয়াক্তে আসরসহ পড়া।

- **খ. জমে তাখির (جمع تأخير):** প্রথম নামাজকে পিছিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় নামাজের সময়ে পড়া।
    - *উদাহরণ:* মুজদালিফায় মাগরিবের নামাজ না পড়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া। অথবা সফরে আসরের ওয়াক্তে জোহরসহ পড়া।

২. জমে সুরি (الجمع الصوري):
এর অর্থ হলো 'বাহ্যিক বা দৃশ্যত একত্রীকরণ'। অর্থাৎ নামাজগুলো আসলে স্ব-স্ব ওয়াক্তেই পড়া হয়, কিন্তু পড়ার সময় এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যে মনে হয় দুটি নামাজ একসাথে পড়া হচ্ছে।

- *পদ্ধতি:* প্রথম নামাজটি তার ওয়াক্তের একদম শেষ মুহূর্তে পড়া এবং সালাম ফেরানোর পরপরই দ্বিতীয় নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়া এবং তখনই দ্বিতীয় নামাজ পড়া।
- *উদাহরণ:* জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ৫-১০ মিনিট আগে জোহর পড়া এবং জোহর শেষ হতে হতেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া এবং সাথে সাথে আসর পড়া। এতে জোহর জোহরের ওয়াক্তে এবং আসর আসরের ওয়াক্তেই হলো, কিন্তু মাঝখানে কোনো দীর্ঘ বিরতি না থাকায় মনে হলো 'জময়ে' বা একত্রীকরণ করা হয়েছে।

হানাফি অবস্থান:
হানাফি মাযহাবে আরাফাত ও মুজদালিফা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণিত 'জময়ে'-এর অর্থ হলো এই 'জমে সুরি'। কারণ এতে কুরআনের আয়াতের ওপর আমল ঠিক থাকে এবং হাদিসের ওপরও আমল হয়।

---

৩. 'জময়ে' কী? দুই নামাজের একত্রীকরণের প্রকারভেদগুলো স্পষ্ট করো। (ما الجمع؟ اوضح انواع الجمع بين الصلاتين)
উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি ২য় প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি, তবে এখানে সংজ্ঞার ওপর জোর দেওয়া হলো)

'জময়ে' (الجمع)-এর পরিচয়:

'জময়ে' শব্দের অর্থ একত্র করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা—এই দুই জোড়া নামাজকে কোনো বিশেষ ওজরের কারণে (যেমন সফর, হজ্জ, অসুস্থতা) একই সময়ে আদায় করাকে 'জময়ে' বলা হয়। ফজর এবং এশার সাথে অন্য কোনো নামাজ একত্র করার সুযোগ নেই।

প্রকারভেদ ও বিশ্লেষণ:

পূর্ববর্তী উত্তরে আলোচিত প্রকারভেদগুলো (জমে হাকিকি ও জমে সুরি) ছাড়াও, হুকুমের দিক থেকে প্রকারভেদ আলোচনা করা যেতে পারে:

১. জমে মাসনুন (সুন্নাতসম্মত একত্রীকরণ):

সকল মাযহাবের ঐকমত্যে আরাফাতের ময়দানে জোহর-আসর এবং মুজদালিফায় মাগরিব-এশা একত্র করা সুন্নাত। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হজ্জের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

২. জমে মুখতালাফ ফিহি (মতভেদপূর্ণ একত্রীকরণ):

সফর, বৃষ্টি বা অসুস্থতার কারণে অন্য সময়ে নামাজ একত্র করা। এটি শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবে জায়েজ (শর্তসাপেক্ষে), কিন্তু হানাফি মাযহাবে নাজায়েজ (বরং জমে সুরি করতে হবে)।

৩. জমে মুতলাক (সাধারণ একত্রীকরণ - শিয়া মত):

কোনো কারণ ছাড়াই সর্বদা দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র করা। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল মাযহাবে নাজায়েজ। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে শিয়া সম্প্রদায় জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা সবসময় একত্র করে পড়ে, যা সুন্নাহর পরিপন্থী।

---

৪. রাসুল (সা.)-এর বাণী "তিনি উম্মতকে কষ্টে ফেলতে চাননি"—এর সাথে আল্লাহর বাণী "নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ"-এর আপাত বিরোধ কীভাবে নিরসন করবে? (قوله عليه السلام "اراد أن لا يحرج امته"

يعارض قوله تعالى "أن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (فكيف التطبيق بينهما ؟

উত্তর:

বিরোধ (তাআরুজ):

- **কুরআনের আয়াত:** "নিশ্চয়ই নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ" (সূরা নিসা: ১০৩)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রতিটি নামাজ তার নিজস্ব সময়ে পড়তে হবে, সময়ের আগে বা পরে পড়া যাবে না।
- হাদিসের বক্তব্য: "তিনি উম্মতের কষ্ট লাঘব করতে চেয়েছেন"। এই হাদিস এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আমল বাহ্যত প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে সময়ের নিয়ম শিথিল করা যায় এবং দুই নামাজ একত্র করা যায়।

এই দুই দলিলে আপাতদৃষ্টিতে সংঘর্ষ বা বিরোধ দেখা যাচ্ছে।

সমন্বয় ও সমাধান (Tatbiq):

১. হানাফি ফকিহদের সমাধান (জমে সুরি):

হানাফি ফকিহগণ বলেন, কুরআনের আয়াতটি 'মুহকাম' বা অকাট্য এবং সুস্পষ্ট। হাদিসটি 'খবরে ওয়াহিদ'। উসুল আল-ফিকহ অনুযায়ী, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের অকাট্য বিধান বাতিল করা যায় না। তাই হাদিসটিকে কুরআনের সাথে মিল রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

সমাধান হলো: হাদিসে যে একত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, তা 'জমে সুরি'। অর্থাৎ রাসুল (সা.) উম্মতের কষ্ট দূর করার জন্য এই সুবিধা দিয়েছেন যে, তারা চাইলে সফরের সময় বা ব্যস্ততার সময় জোহরকে দেরি করে এবং আসরকে জলদি করে পাশাপাশি পড়তে পারে। এতে সময়ের নিয়মও রক্ষা পেল (আয়াত মানা হলো), আবার বারবার ওজু বা নামাজের প্রস্তুতির ঝামেলাও কমল (হাদিস মানা হলো)। এটাই উম্মতের জন্য প্রকৃত স্বস্তি।

২. শাফেয়ি ও জুমহুর ফকিহদের সমাধান (তাসখিস):

তাঁরা বলেন, কুরআনের আয়াতটি হলো 'আম' (সাধারণ নিয়ম)। আর হাদিসটি হলো 'খাস' (বিশেষ বিধান)। উসুলের নিয়ম হলো, বিশেষ বিধান সাধারণ নিয়মকে নির্দিষ্ট করে দেয় (Takhsis), বাতিল করে না।

অর্থাৎ, সাধারণভাবে নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ। কিন্তু সফর বা বিশেষ ওজরের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর নবীজির মাধ্যমে ছাড় (Rukhsat) দিয়েছেন। এই ছাড় গ্রহণ করা আয়াতের বিরোধী নয়, বরং আল্লাহর রহমতের অংশ। "কষ্ট দূর করা"—এর অর্থ হলো, সফর অবস্থায় বারবার থামার কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য হাকিকিভাবে একত্র করার অনুমতি দেওয়া।

উপসংহার: হানাফি সমাধানটি অধিক শক্তিশালী, কারণ এতে আয়াত ও হাদিস উভয়ের শাব্দিক ও তাত্ত্বিক অর্থের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ হয়।

---

৫. দলিলসহ এমন স্থানগুলোর উল্লেখ করো যেখানে 'জমে হাকিকি' (প্রকৃত একত্রীকরণ) জায়েজ। (اذكر المواضع التي يجوز فيها الجمع الحقيقى بين الصلاتين بالادلة)

উত্তর:

সকল মাযহাবের ঐকমত্যে (ইজমা) ইসলামি শরিয়তে মাত্র দুটি স্থানে 'জমে হাকিকি' বা প্রকৃত একত্রীকরণ জায়েজ এবং সুন্নাত। এই দুটি স্থান হজ্জের সাথে সম্পর্কিত।

১. আরাফাতের ময়দান (৯ই জিলহজ):

আরাফাতের দিনে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসর—উভয় নামাজ একত্রে আদায় করা হয়। একে 'জমে তাকদিম' বলে।

- **শর্ত:** অবশ্যই জামাতের সাথে এবং আমিরের (ইমামের) পেছনে আদায় করতে হবে (হানাফি মতে)।
- **দলিল:** হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে এসেছে:

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

অর্থ: অতঃপর (রাসুল সা.) আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন, তারপর জোহর পড়লেন। এরপর (আবার) ইকামত দিলেন এবং আসর পড়লেন। উভয়ের মাঝখানে কোনো নফল পড়েননি। (সহিহ মুসলিম)

২. মুজদালিফা (৯ই জিলহজ দিবাগত রাত):

আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা—উভয় নামাজ এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা হয়। একে 'জমে তাখির' বলে।

- **শর্ত:** মাগরিবের সময় রাস্তায় পড়া যাবে না, মুজদালিফায় গিয়েই পড়তে হবে।
- **দলিল:** হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন:

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ... حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন... মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করলেন। (সহিহ বুখারি)

অন্যান্য স্থান (মতভেদপূর্ণ):

হানাফি মাযহাব ছাড়া অন্য মাযহাবে সফর, বৃষ্টি ও অসুস্থতার সময়ও জমে হাকিকি জায়েজ। তবে হানাফি মতে ঐ দুটি স্থান ছাড়া আর কোথাও জায়েজ নেই।

---

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة ابن عباس (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আপন চাচাতো ভাই। তাঁর উপনাম 'আবুল আব্বাস'। মাতার নাম উম্মুল ফজল লুবাবা। তিনি হিজরতের ৩ বছর পূর্বে মক্কায় 'শিআবে আবি তালিবে' জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও মর্যাদা:

তিনি ছিলেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করেছিলেন:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা (তাফসির) শিক্ষা দিন। (সহিহ বুখারি)

এই দোয়ার বরকতে তিনি **'হাবরুল উম্মাহ'** (উম্মতের মহাবিদ্বান) এবং **'তুরজুমানুল কুরআন'** (কুরআনের ভাষ্যকার) খেতাবে ভূষিত হন। সাহাবিরা জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। হযরত ওমর (রা.) বয়োজ্যেষ্ঠ বদরি সাহাবিদের মজলিসে এই তরুণ সাহাবিকে স্থান দিতেন।

হাদিস বর্ণনা:

তিনি 'মুকাসসিরিন' সাহাবিদের (অধিক হাদিস বর্ণনাকারী) অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১,৬৬০টি। তিনি ফিকহ, তাফসির, হাদিস, আরবি সাহিত্য এবং বংশলতিকা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ইন্তেকাল:

জীবনের শেষ দিকে তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৬৮ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে তায়েফ নগরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রা.) তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন। তাঁকে তায়েফেই দাফন করা হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

9- عن الزبرقان قال ان رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فارسلوا اليه غلامين لهم يسألانه عن الصلوة الوسطى فقال هي الظهر فقام اليه رجلان منهم فقال في الظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه الا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال او لا حرقن بيوتهم -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الهجير؟ وما المراد به في الحديث؟ بين
2- ما معنى الوسطى؟ ما الاختلاف في تعيين الصلوة الوسطى بين العلماء؟ بين موضحا –
3- لماذا اختص الله الصلاة الوسطى بالاهتمام بها في الأية مع انها من ضمن الصلوات؟
4- لم سمى صلاة العصر بصلاة الوسطى؟
5- بين اختلاف العلماء في اول وقت العصر واخره –
6- بين أهمية صلوة الفجر والعصر بالادلة –
7- متى نزلت اية "حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى"؟
8- متى فرضت الصلوات الخمسة؟
9- من هو زيد بن ثابت؟ اذكر ماذا تعلم عنه بالاختصار-

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن الزبرقان قال ان رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فارسلوا اليه غلامين لهم يسألانه عن الصلوة الوسطى فقال هي الظهر فقام اليه رجلان منهم فقال في الظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه الا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات

والصلوة الوسطى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال او لا حرقن بيوتهم.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি 'সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী নামাজ কোনটি—তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি ভিন্নধর্মী দলিল। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৪১১), ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি সনদের দিক থেকে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মদিনায় দুপুরের প্রচণ্ড গরমে মানুষ যখন বিশ্রাম (কায়লুলা) বা ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত, তখন জোহরের জামাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে যেত। রাসুলুল্লাহ (সা.) এতে খুব মনক্ষুণ্ন হতেন। কুরাইশদের একটি দল 'সালাতুল উসতা' নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে তারা বিশিষ্ট সাহাবি ও ওহি লেখক জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর কাছে এর সমাধান জানতে চান। তিনি জোহরকে 'সালাতুল উসতা' বলে মত প্রকাশ করেন এবং এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত যিবরিকান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কুরাইশদের একটি দল একত্রিত হয়ে (সালাতুল উসতা সম্পর্কে) আলোচনা করছিল। তখন তাদের পাশ দিয়ে জায়েদ বিন সাবিত (রা.) যাচ্ছিলেন। তারা তাদের দুজন গোলামকে তাঁর কাছে পাঠাল সালাতুল উসতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি বললেন: "তা হলো জোহরের নামাজ।"

অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দুজন লোক তাঁর কাছে এসে জোহরের ব্যাপারে জানতে চাইল। তিনি বললেন: "রাসুলুল্লাহ (সা.) ভরদুপুরের প্রচণ্ড গরমে জোহরের নামাজ আদায় করতেন। তখন তাঁর পেছনে এক বা দুই কাতার মুসল্লি ছাড়া আর কেউ থাকত না। মানুষ তখন তাদের 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম) এবং ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন—'তোমরা নামাজসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি।' এরপর নবীজি (সা.) বললেন: 'মানুষ যেন (জামাত তরক

করা থেকে) বিরত হয়, নতুবা আমি অবশ্যই তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব'।"

ব্যাখ্যা:

- **হাজির (الهجير):** এর অর্থ হলো মধ্য দুপুরের তীব্র গরম।
- **জোহরের গুরুত্ব:** জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর মতে, জোহরই সালাতুল উসতা, কারণ এটি দিনের মধ্যভাগে হয় এবং গরমের কারণে এটি আদায় করা কষ্টকর। তাই আল্লাহ বিশেষভাবে এর যত্ন নিতে বলেছেন। তবে জমহুর উলামাদের মতে সালাতুল উসতা হলো আসর।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব এবং তা ত্যাগ করা মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা ব্যস্ততা বা আরামের অজুহাতে নামাজ অবহেলা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'আল-হাজির' (الهجير) শব্দের অর্থ কী? হাদিসে এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما معنى الهجير؟ وما المراد به في الحديث؟ بين)

উত্তর:

ক. শাব্দিক অর্থ:

'আল-হাজির' (الهجير) শব্দটি আরবি 'হাজর' (هجر) বা 'হাজিরা' (هاجرة) মূলধাতু থেকে এসেছে। অভিধানে এর অর্থ হলো:

১. প্রচণ্ড গরম (شدة الحر): দিনের যে সময়টিতে সূর্যের তাপ সর্বাধিক থাকে।

২. দ্বিপ্রহর (نصف النهار): সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে বা ঢলে পড়ার মুহূর্তে থাকে।

খ. হাদিসে এর উদ্দেশ্য (মুরাদ):

আলোচ্য হাদিসে "কানা ইউসাল্লি আজ-জোহরা বিল হাজিহি" বাক্যে 'হাজির' দ্বারা 'জোহরের আউয়াল ওয়াক্ত' বা 'সূর্য ঢলে পড়ার ঠিক পরমুহূর্ত' বোঝানো হয়েছে। আরব দেশে দুপুরের এই সময়টি ছিল অসহনীয় গরমের সময়।

তাৎপর্য:
হাদিসে এই শব্দটি ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে:
১. কষ্টের প্রকাশ: সাহাবিদের জন্য জোহরের নামাজ জামাতে পড়া কেন কঠিন ছিল, তা বোঝাতে এই শব্দটি এসেছে। মদিনার উত্তপ্ত মরুর বুকে ওই সময়ে ঘর থেকে বের হওয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।
২. অলসতার কারণ: প্রচণ্ড গরমের কারণে মানুষ স্বভাবতই ঘরে বিশ্রাম নিতে চাইত অথবা বাজারের ছায়ায় ব্যবসায় মগ্ন থাকত। একারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে মাত্র এক বা দুই কাতার মুসল্লি হতো।
৩. ইবরাদ (শীতল করা): পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এই কষ্ট লাঘব করার জন্য গরমের দিনে জোহরকে কিছুটা দেরি করে বা 'ঠান্ডা করে' (ইবরাদ) পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপটে বা শুরুর দিকে তিনি 'হাজির' বা গরমের সময়েই নামাজ পড়তেন।

---

২. 'আল-উসতা' (الوسطى) অর্থ কী? সালাতুল উসতা নির্ধারণে আলেমদের মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করো। (ما معنى الوسطى؟ ما الاختلاف في تعيين الصلوة الوسطى بين العلماء؟ بين موضحا)

উত্তর:
ক. আল-উসতা এর অর্থ:
'উসতা' শব্দটি 'আওসাত' (أوسط) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ হলো:
১. মধ্যবর্তী (The Middle One): যা দুই জিনিসের মাঝখানে থাকে।
২. সর্বোৎকৃষ্ট (The Best): যেমন বলা হয় 'কুরাইশরা বংশ মর্যাদায় আরবদের মধ্যমণি বা সেরা'।
খ. সালাতুল উসতা কোনটি—এ নিয়ে মতভেদ:
কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা সালাতুল উসতার প্রতি যত্নবান হও"। কিন্তু কোনটি সেই নামাজ, তা নির্দিষ্ট করা নেই। এ নিয়ে ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে প্রায় ১৮টি মত পাওয়া যায়। প্রধান ৪টি মত নিচে দেওয়া হলো:
১. জুমহুর উলামা (হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি) ও অধিকাংশ সাহাবি:
তাঁদের মতে, সালাতুল উসতা হলো আসরের নামাজ (Salatul Asr)।

- **দলিল:** খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন:

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

অর্থ: তারা (কাফেররা) আমাদের সালাতুল উসতা অর্থাৎ আসরের নামাজ থেকে বিরত রেখেছে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

- **যুক্তি:** এটি দিনের দুই নামাজ (ফজর, জোহর) এবং রাতের দুই নামাজের (মাগরিব, এশা) ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।

২. ইমাম মালিক (রহ.) ও শাফেয়ি (পুরাতন মত):

তাঁদের মতে, সালাতুল উসতা হলো ফজরের নামাজ (Salatul Fajr)।

- **দলিল:** কুরআনের আয়াত "কূমূ লিল্লা-হি ক-নিতিন" (আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়াও)—এটি ফজরের সময় নাজিল হয়েছে। তাছাড়া ফজর রাত ও দিনের নামাজের মাঝখানে থাকে। এবং এটি পড়া সবচেয়ে কঠিন।

৩. জায়েদ বিন সাবিত (রা.) ও কিছু তাবেয়ি:

আলোচ্য হাদিস অনুযায়ী তাদের মতে এটি জোহরের নামাজ (Salatul Zuhr)।

- **যুক্তি:** এটি দিনের মাঝখানে হয় এবং মানুষ তখন গাফেল থাকে।

৪. **একটি বিরল মত:** এটি **মাগরিবের নামাজ**। কারণ মাগরিবের রাকাত সংখ্যা (৩) চার ও দুইয়ের মাঝখানে।

রাজিন (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মত:

সহিহ হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী আসরের নামাজই সালাতুল উসতা। হানাফি ও জুমহুর ফকিহগণ এই মতটিকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছেন।

---

৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ কেন সালাতুল উসতাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিলেন? (لماذا اختص الله الصلاة الوسطى بالاهتمام بها في الأية مع انها من ضمن الصلوات؟)

উত্তর:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

অর্থ: তোমরা সকল নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি। (সূরা বাকারা: ২৩৮)

এখানে সকল নামাজের (আস-সালাওয়াত) কথা বলার পর আবার আলাদাভাবে 'সালাতুল উসতা'র কথা বলার হেকমত বা কারণগুলো হলো:

১. যিক্রুল খাস বা'দাল আম (ذكر الخاص بعد العام):

আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণ আলোচনার পর বিশেষ কোনো কিছুর নাম উল্লেখ করা তার অতিরিক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝায়। যেমন আল্লাহ বলেন, "ফেরেশতারা এবং জিবরাইল ও মিকাইল নাজিল হয়"। জিবরাইল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম আলাদা নেওয়া হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। তেমনি সালাতুল উসতা অন্য নামাজের চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ।

২. অবহেলা দূরীকরণ:

সালাতুল উসতা (অধিকাংশের মতে আসর) এমন এক সময়ে হয় যখন মানুষ দিনের কাজ শেষ করতে, ব্যবসায়িক লেনদেন গুছাতে বা ক্লান্তিতে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততার কারণে আসর কাজা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই আল্লাহ বিশেষভাবে এই ওয়াক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৩. ফেরেশতাদের মিলনমেলা:

আসরের সময় রাত ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হন। এটি দোয়া কবুলের এবং আমলনামা আল্লাহর কাছে পেশ করার বিশেষ মুহূর্ত। এই সময়ের বিশেষ বরকতের কারণে একে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. পরীক্ষা:

মানুষের প্রিয় কাজ বা বিশ্রামের সময়ে ইবাদতের ডাক দেওয়া হলো ঈমানের পরীক্ষা। যারা এই সময়ে নামাজে হাজির হয়, তারা প্রকৃত মুমিন।

---

৪. আসরের নামাজকে কেন 'সালাতুল উসতা' (মধ্যবর্তী নামাজ) বলা হয়? (لم سمى صلاة العصر بصلاة الوسطى؟)

উত্তর:

আসরের নামাজকে 'সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী নামাজ নামকরণ করার পেছনে মুফাসসির ও ফকিহগণ বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ দর্শিয়েছেন:

১. সংখ্যার বিচারে মধ্যবর্তী:

মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে আসর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।

- এর আগে দুটি নামাজ: ফজর ও জোহর।
- এর পরে দুটি নামাজ: মাগরিব ও এশা।

সুতরাং এটি অবস্থানগতভাবে মধ্যমণি।

২. সময়ের বিচারে মধ্যবর্তী:

এটি দিনের বেলার নামাজগুলোর শেষে এবং রাতের আগমনী বার্তার শুরুতে অবস্থিত। অর্থাৎ এটি দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণের পূর্ববর্তী নামাজ।

৩. দৈর্ঘ্যের বিচারে মধ্যবর্তী:

জোহর, আসর ও এশা হলো ৪ রাকাত বিশিষ্ট। ফজর ২ রাকাত এবং মাগরিব ৩ রাকাত। আসর হলো সেই ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যা ছোট (২/৩) এবং বড় (৪) রাকাতের নামাজের মাঝখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. শ্রেষ্ঠত্বের কারণে:

'উসতা' শব্দের অর্থ হলো 'সর্বোৎকৃষ্ট'। আসরের নামাজ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো, এই সময়ে ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

অর্থ: তোমাদের মাঝে রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা পালাবদল করেন এবং তারা ফজর ও আসরের নামাজে একত্রিত হন। (বুখারি)

---

৫. আসরের নামাজের প্রথম ও শেষ সময় সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করো। (بين اختلاف العلماء في اول وقت العصر واخره)

উত্তর:

আসরের ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ নিয়ে ইমামদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ক. আসরের শুরুর সময় (আউয়াল ওয়াক্ত):

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.): কোনো বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) যখন তার দ্বিগুণ (Mithl Thani) হয়, তখন জোহর শেষ হয় এবং আসর শুরু হয়।

* যুক্তি: হাদিসে জোহরকে ঠান্ডা করতে বলা হয়েছে, যা এক গুণ ছায়ায় সম্ভব হয় না।

২. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ও সাহিবাইন: কোনো বস্তুর ছায়া যখন তার এক গুণ (Mithl Awwal) বা সমপরিমাণ হয়, তখন থেকেই আসর শুরু হয়।

* যুক্তি: হাদিসে জিবরাইল (আ.)-এর আমল।

খ. আসরের শেষ সময় (আখের ওয়াক্ত):

১. ওয়াক্তে ইখতিয়ারি (পছন্দনীয় সময়): সকল ইমামের মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত (সূর্যাস্তের প্রায় ২০ মিনিট আগে) আসরের পছন্দনীয় সময়। এর মধ্যে নামাজ পড়া উত্তম।

* রাসুল (সা.) বলেন: "আসরের সময় থাকে যতক্ষণ না সূর্য হলুদ হয়।" (মুসলিম)

২. ওয়াক্তে কারাহাত (মাকরুহ সময়): সূর্য হলুদ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টি মাকরুহ। তবে এই সময়ে নামাজ পড়লে আদায় হয়ে যাবে (কাজা হবে না), কিন্তু ইচ্ছাকৃত দেরি করা গুনাহ।

৩. ওয়াক্ত শেষ হওয়া: সূর্যাস্তের সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং মাগরিব শুরু হয়—এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাবে ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার মত (দ্বিগুণ ছায়া) অনুযায়ী, তবে প্রয়োজনে এক গুণ ছায়ার পরও পড়া জায়েজ।

---

৬. দলিলসহ ফজর ও আসর নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করো। (بين أهمية صلوة الفجر والعصر بالادلة)

উত্তর:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজর ও আসরের গুরুত্ব সর্বাধিক। হাদিসে এই দুই নামাজকে 'বারদাইন' (দুই শীতল সময়ের নামাজ) বলা হয়েছে।

গুরুত্ব ও ফজিলত:

১. জান্নাতের নিশ্চয়তা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

অর্থ: যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) নামাজ আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (সহিহ মুসলিম)

৩. আল্লাহর দিদার লাভ:

প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, সাহাবিরা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তখন নবীজি (সা.) বলেন: "তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে এভাবে দেখতে পাবে... তাই তোমরা যদি পারো সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের নামাজে পরাভূত না হতে (অর্থাৎ কাজা না করতে), তবে তাই করো।" (বুখারি)

৪. আমলনামা পেশ:

আসরের সময় দিনের আমলনামা এবং ফজরের সময় রাতের আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তখন বান্দা নামাজে থাকলে আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।

কারণ: ফজর ঘুমের কারণে এবং আসর কাজের কারণে ত্যাগ করা সহজ। তাই এই দুই সময়ে নফসকে দমন করে নামাজ পড়া ঈমানের বড় প্রমাণ।

---

৭. "তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং সালাতুল উসতার প্রতি"— এই আয়াতটি কখন নাজিল হয়? (متى نزلت اية "حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى"؟)

উত্তর:

নাজিলের প্রেক্ষাপট ও সময়কাল:

সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াত "হাফিজু আলাস সালাওয়াত..." মদিনায় নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য হাদিস অনুযায়ী, মদিনায় যখন প্রচণ্ড গরমে জোহরের নামাজে মুসল্লির উপস্থিতি কমে যাচ্ছিল এবং মানুষ দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল, তখন তাদের সতর্ক করার জন্য এই আয়াত নাজিল হয়।

হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) দুপুরে নামাজ পড়তেন... এবং মানুষের অবস্থা এমন ছিল... তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।"

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

অন্য বর্ণনায় এসেছে, খন্দকের যুদ্ধের সময় (৫ম হিজরি) যখন কাফেরদের আক্রমণের কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের আসরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল, তখন এই আয়াতের গুরুত্ব আরও ফুটে ওঠে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই আয়াতটি মদিনার প্রাথমিক বা মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে যখন সমাজ গঠন ও মুনাফিকদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছিল।

উদ্দেশ্য:

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং বলেন, "যারা জামাতে আসে না, আমার ইচ্ছা হয় তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই।" এই আদেশের পর সাহাবিরা নামাজের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

---

৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কখন ফরজ হয়েছে? (متى فرضت الصلوات الخمسة؟)

উত্তর:

সময়কাল:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছে পবিত্র লাইলাতুল মিরাজ বা মিরাজের রজনীতে। ঐতিহাসিকদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, এটি ছিল হিজরতের প্রায় এক বা দেড় বছর আগে।

অধিকাংশের মতে, এটি নবুয়তের ১০ম বা ১১তম বর্ষের ২৭শে রজব রাতে সংঘটিত হয়।

ঘটনাপ্রবাহ:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মিরাজে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানোর পর সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আল্লাহ তাআলা সরাসরি (কোনো মাধ্যম ছাড়া) উম্মতে মুহাম্মদির ওপর প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।

ফিরে আসার পথে হযরত মুসা (আ.)-এর পরামর্শে রাসুলুল্লাহ (সা.) কয়েকবার আল্লাহর দরবারে গিয়ে কমিয়ে আনেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা ৫ ওয়াক্ত নির্ধারণ করেন এবং ঘোষণা দেন:

هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ

অর্থ: (কাজের ক্ষেত্রে) তা পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু (সওয়াবের ক্ষেত্রে) তা পঞ্চাশ ওয়াক্ত। (সহিহ বুখারি)

এর আগে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.) কেবল সকাল ও সন্ধ্যায় দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন (মতান্তরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল)। মিরাজের পর থেকে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর—এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

---

৯. হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) কে? তাঁর সম্পর্কে যা জানো সংক্ষেপে লেখ। (من هو زيد بن ثابت؟ اذكر ماذا تعلم عنه بالاختصار)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম জায়েদ, পিতার নাম সাবিত। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তাঁর উপনাম 'আবু সাইদ' বা 'আবু আবদুর রহমান'। হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

জ্ঞান ও দক্ষতা:

১. কাতিবুল ওহি (ওহি লেখক): তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান ওহি লেখকদের একজন। কুরআনের আয়াত নাজিল হলে নবীজি (সা.) তাঁকে ডাকতেন লেখার জন্য।

২. ভাষা জ্ঞান: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তিনি মাত্র ১৫ বা ১৭ দিনে ইহুদিদের ভাষা (হিব্রু/সুরিয়ানি) শিখে ফেলেছিলেন, যাতে তিনি তাদের চিঠিপত্র পড়তে ও লিখতে পারেন।

৩. ইলমুল ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন): তিনি মিরাস বা উত্তরাধিকার বন্টন আইনে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন। রাসুল (সা.) বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে ফারায়েজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী জায়েদ বিন সাবিত।"

কুরআন সংকলন:

ইসলামের ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো পবিত্র কুরআন সংকলন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুরআনের অংশগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাকার রূপ দেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.)-এর সময়েও তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৪৫ হিজরি মতান্তরে ৫৫ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছিলেন, "আজ এই উম্মতের অনেক বড় জ্ঞান হারিয়ে গেল।"

10- عائشة (رض) قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح متلفعات بحروطهن ثم يرجعن الى اهلهن وما يعرفهن أحد-

عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- صلوة الفجر افضل في الغلس ام في الاسفارا بين-

او- الغلس افضل أم الإسفار لأداء صلاة الفجر؟

او- بين اقوال العلماء في الغلس والاسفار لصلوة الصبح ورجع ما هو الراجح عندك ؟

2- بين حكم صلاة النساء مع الجماعة في المساجد –

او- ما قولك في صلوة النساء مع الرجال بالجماعة؟ هات الدليل على ما تقول –

3- ما الاختلاف بين العلماء في بطلان صلوة الصبح عند الطلوع ؟ بين بالادلة –

او- تحدث عن أراء العلماء في بطلان صلاة الفجر عند طلوع الشمس

4- اذكر الأوقات المكروهة للصلاة -

5- حقق كلمتى : متلفعات ويرجعن –

6- من فاتته سنة الفجر هل يصلى بعد الفجر ام بعد طلوع الشمس؟ بين اقوال العلماء فيها –

7- الحديث الاول يعارض الحديث الثاني فما التوفيق بينهما ؟

8- حديث عائشة (رض) يدل على أن النبي ﷺ كان يصلى صلوة الفجر في الغلس - فلم لم يعمل الاحناف بهذا الحديث؟ وبم استدلوا؟

9- بين اختلاف العلماء في تعيين الوقت المستحب في الفجر -

10-ما معنى الغلس والاسفار؟

11-بين اهمية صلوة الفجر والعصر بالادلة –
12-ما هو محل حديث عائشة عند الاحناف ؟
13-ما المراد بالمعرفة المنفية في الحديث؟
14-بين نبذة من حياة أم المؤمنين عائشة (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن عائشة (رض) قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح متلفعات بحروطهن ثم يرجعن الى اهلهن وما يعرفهن أحد.

মূল হাদিস (২):

عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, যা 'তাগলিস' (অন্ধকারে নামাজ পড়া)-এর দলিল। এটি ইমাম বুখারি (হাদিস নং ৫৭২) ও মুসলিম (হাদিস নং ৬৪৫) সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয় হাদিসটি রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, যা 'ইসফার' (ফর্সা করে নামাজ পড়া)-এর দলিল। এটি ইমাম তিরমিজি (হাদিস নং ১৫৪), আবু দাউদ (হাদিস নং ৪২৪) ও নাসায়ি সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'হাসান সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

ফজরের নামাজের মুস্তাহাব সময় কোনটি—অন্ধকার থাকা অবস্থায় নাকি আলো ছড়িয়ে পড়ার পর? এ নিয়ে সাহাবি ও ইমামদের মধ্যে মতভেদ নিরসনের জন্য এই দুটি হাদিস পাশাপাশি আলোচনা করা হয়। প্রথম হাদিসটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ অভ্যাসের চিত্র তুলে ধরে, আর দ্বিতীয় হাদিসটি সওয়াব বৃদ্ধির জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনামূলক বাণী।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মুমিন নারীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। তাঁরা নিজেদের চাদর দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখতেন। অতঃপর নামাজ শেষে তাঁরা যখন পরিবারের কাছে ফিরে যেতেন, তখন (অন্ধকারের কারণে) কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা ফজরকে ফর্সা করে (আলোকিত সময়ে) পড়ো। কেননা, যত বেশি ফর্সা করে পড়বে, তা সওয়াবের দিক থেকে তত মহৎ (বা তোমাদের সওয়াবের জন্য তত বেশি)।"

ব্যাখ্যা:

প্রথম হাদিসে 'তাগলিস' বা অন্ধকারের গুরুত্ব পাওয়া যায়, যা জুমহুর ফকিহদের দলিল। আর দ্বিতীয় হাদিসে 'ইসফার' বা আলো হওয়ার গুরুত্ব পাওয়া যায়, যা হানাফিদের দলিল। 'মুতালাফফিআত' অর্থ চাদর মুড়ি দেওয়া। 'আসফিরু' অর্থ ফর্সা করা বা সুবহে সাদিক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৪. الحاصل (সমাপনী):

উভয় হাদিসের সামঞ্জস্য হলো—নামাজ অন্ধকারে শুরু করা এবং দীর্ঘ কেরাত পড়ে ফর্সা হওয়ার সময় শেষ করা। এটিই হানাফি মাযহাবের উত্তম আমল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. ফজরের নামাজ কি 'গালাস' (অন্ধকারে) পড়া উত্তম নাকি 'ইসফার' (ফর্সা করে) পড়া উত্তম? আলেমদের মতামত ও আপনার নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি বর্ণনা করো। (صلوة الفجر افضل في الغلس ام في الاسفارا بين)

উত্তর:

ফজরের নামাজের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ফকিহদের মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। একে 'মাসআলাতুল গালাস ওয়াল ইসফার' বলা হয়।

১. জুমহুর উলামা (ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ):

তাঁদের মতে, ফজরের নামাজ 'গালাস' বা অন্ধকারের মধ্যে পড়া উত্তম। অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার পরপরই নামাজ শুরু করা এবং আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হওয়ার আগেই শেষ করা।

- **দলিল:** হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস। নারীরা নামাজ শেষে ফিরতেন এবং অন্ধকারের কারণে তাঁদের চেনা যেত না। এটি প্রমাণ করে রাসুল (সা.) অন্ধকারে নামাজ শেষ করতেন।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতে, ফজরের নামাজ 'ইসফার' বা ফর্সা করে পড়া উত্তম। অর্থাৎ অন্ধকারে শুরু করা কিন্তু শেষ করতে করতে আকাশ যেন আলোকিত হয়ে যায়।

- **দলিল:** রাফে ইবনে খাদিজ (রা.)-এর হাদিস: **"আসফিরু বিল ফজর"** (তোমরা ফজরকে ফর্সা করো)। এবং রাসুল (সা.) বলেছেন, "ফর্সা করা সওয়াবের জন্য মহৎ।"
- **যুক্তি:** ফর্সা করে পড়লে জামাতে বেশি মুসল্লি শরিক হতে পারে। এছাড়া নামাজে ভুল হলে সূর্য ওঠার আগেই তা শুধরানোর সময় পাওয়া যায়।

রাজিন বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত (আমার অভিমত):

হানাফি ফকিহ ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর সমন্বয়টিই যুক্তিযুক্ত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজে দীর্ঘ কেরাত (৬০ থেকে ১০০ আয়াত) পড়তেন। তিনি শুরু করতেন অন্ধকারে (গালাস), আর দীর্ঘ কেরাত পড়ার কারণে শেষ করার সময় ফর্সা (ইসফার) হয়ে যেত। সুতরাং, শুরুর দিক থেকে হাদিসটি 'গালাস'-এর পক্ষে এবং সমাপ্তির দিক থেকে 'ইসফার'-এর পক্ষে। হানাফি মাযহাবের আমলটি উভয় হাদিসের ওপর আমল নিশ্চিত করে। তাই ইসফারই (শেষ করার বিচারে) উত্তম।

---

২. মসজিদে পুরুষদের জামাতে নারীদের নামাজ পড়ার হুকুম কী? দলিলসহ আলোচনা করো। (بين حكم صلاة النساء مع الجماعة في المساجد)

উত্তর:

মসজিদে জামাতের সাথে নারীদের নামাজ আদায়ের বিধানটি সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (বৈধতা):

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীদের মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়ার অনুমতি ছিল। আলোচ্য আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটিই তার প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (নারীদের) আল্লাহর মসজিদ থেকে বারণ করো না। (সহিহ মুসলিম)

২. পরবর্তী যুগ ও বর্তমান ফতোয়া (নিষেধাজ্ঞা):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং পরবর্তী অধিকাংশ ফকিহদের মতে, বর্তমানে নারীদের জন্য জামাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসা 'মাকরুহ তাহরিমি' (হারামের কাছাকাছি)। বিশেষ করে যুবতী নারীদের জন্য।

কারণ (ইল্লত): ফেতনা বা সামাজিক অবক্ষয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মানুষের ঈমান ও তাকওয়া ছিল মজবুত, তাই নিরাপত্তার ঝুঁকি ছিল না। কিন্তু এখন সমাজ কলুষিত হয়েছে।

দলিল:

স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.), যিনি নারীদের নামাজে যাওয়ার হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুল (সা.)-এর ওফাতের কিছুকাল পরে সাহাবিদের যুগে নারীদের অবস্থা দেখে বলেছিলেন:

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অর্থ: নারীরা এখন যা নতুন করে উদ্ভাবন করেছে (সাজসজ্জা ও আচরণ), রাসুলুল্লাহ (সা.) যদি তা দেখতেন, তবে অবশ্যই তাদের মসজিদে আসতে

নিষেধ করতেন, যেমন বনি ইসরাইলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল। (সহিহ বুখারি)

সিদ্ধান্ত: বর্তমানে নারীদের জন্য ঘরের নির্জন কোণে নামাজ পড়াই উত্তম এবং অধিক সওয়াবের কাজ। তবে হজ বা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় (পর্দা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে) আলাদা জামাতে অংশগ্রহণ জায়েজ হতে পারে।

---

৩. সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামাজ বাতিল হওয়া বা না হওয়া নিয়ে আলেমদের মতভেদ দলিলসহ লেখ। (ما الاختلاف بين العلماء في بطلان صلوة الصبح عند الطلوع ؟ بين بالادلة)

উত্তর:

যদি কেউ ফজরের নামাজ আদায় করছে, এমতাবস্থায় (সালাম ফেরানোর আগে) সূর্য উদিত হয়ে যায়, তবে সেই নামাজ সহিহ হবে কি না—এ নিয়ে ইমামদের দুটি মত রয়েছে।

১. হানাফি মাযহাব (নামাজ বাতিল):

হানাফি মাযহাব মতে, ফজরের নামাজরত অবস্থায় সূর্যের এক কোণাও যদি উদিত হয়, তবে সেই নামাজ ফাসিদ (বাতিল) হয়ে যাবে। সূর্য পুরোপুরি ওঠার পর তা কাজা আদায় করতে হবে।

যুক্তি:

ফজরের নামাজ ওয়াজিব হয়েছে 'কামিল' (পরিপূর্ণ) সময়ে। আর সূর্যোদয়ের সময়টি হলো 'নাকিস' (ত্রুটিপূর্ণ/হারাম) সময়। 'কামিল' ওয়াজিব কখনো 'নাকিস' পদ্ধতিতে আদায় হতে পারে না। তাছাড়া হাদিসে সূর্যোদয়ের সময় নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

২. শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব (নামাজ সহিহ):

তাঁদের মতে, যদি সূর্যোদয়ের আগে অন্তত এক রাকাত নামাজ পূর্ণ করা যায়, তবে নামাজ বাতিল হবে না, বরং তা আদায় হয়ে যাবে।

দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

অর্থ: যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার আগে ফজরের এক রাকাত পেল, সে ফজর (নামাজ) পেল। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

হানাফিদের জবাব:

হানাফিগণ বলেন, এই হাদিসের অর্থ হলো—সে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত পেল বা তার ওপর নামাজ ফরজ হলো, কিন্তু আদায় করার পদ্ধতি সহিহ হলো কি না তা ভিন্ন বিষয়। যেহেতু নিষিদ্ধ সময় প্রবেশ করেছে, তাই নামাজ ভেঙে যাবে। তবে আসরের ক্ষেত্রে নামাজ হবে না, কারণ আসর নিজেই দিনের শেষ ভাগের নামাজ।

---

৪. নামাজের মাকরুহ সময়গুলো উল্লেখ করো। (اذكر الأوقات المكروهة للصلاة)

উত্তর:

দিনের মধ্যে এমন তিনটি সময় আছে যখন যেকোনো ধরনের নামাজ (ফরজ, নফল বা কাজা) পড়া নিষিদ্ধ বা মাকরুহ তাহরিমি। হাদিসে এই সময়গুলোতে নামাজ পড়তে এবং মৃত দাফন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তিনটি সময়:

১. সূর্যোদয় (তুলুয়ে শামস): সূর্য দিগন্ত থেকে ওঠা শুরু করা থেকে পুরোপুরি উপরে ওঠা পর্যন্ত। এটি প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় স্থায়ী হয়।

২. দ্বিপ্রহর (ইস্তিওয়া/জাওয়াল): ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য মাথার ওপরে স্থির মনে হয়, যতক্ষণ না তা পশ্চিম দিকে সামান্য ঢলে পড়ে।

৩. সূর্যাস্ত (গুরূবে শামস): সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা থেকে শুরু করে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

বিশেষ বিধান:

- এই তিন সময়ে কোনো নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই।
- কোনো কাজা নামাজ পড়া জায়েজ নেই।
- সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ।
- **ব্যতিক্রম:** শুধুমাত্র ওই দিনের **আসরের নামাজ** যদি পড়তে দেরি হয়ে যায়, তবে সূর্যাস্তের সময়ও তা পড়া যাবে (মাকরুহ হবে কিন্তু

আদায় হবে)। কিন্তু অন্য দিনের কাজা আসর এই সময়ে পড়া যাবে না।

---

৫. "মুতালাফফিআত" এবং "ইয়ারজি'না" শব্দদ্বয়ের তাহকিক (বিশ্লেষণ) করো। (حقق كلمتى : متلفعات ويرجعن)

উত্তর:

১. মুতালাফফিআত (متلفعات):

- **শাব্দিক বিশ্লেষণ:** শব্দটি 'তাফাউল' বাব থেকে ইসমে ফায়েল-এর জমা মুয়ান্নাস। এর মূলধাতু (লাম-ফা-আইন)। একবচনে 'মুতালাফফিআহ'।
- **অর্থ:** সর্বাঙ্গ আবৃতকারিণী, চাদর মুড়ি দেওয়া নারী। 'লিফাআ' মানে এমন চাদর যা দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পেঁচিয়ে নেওয়া হয়।
- **তাৎপর্য:** এটি সাহাবি নারীদের পর্দার কঠোরতা নির্দেশ করে। তাঁরা নামাজে আসার সময়ও এমনভাবে চাদর আবৃত হয়ে আসতেন যে শরীরের কোনো অংশ বা আকৃতি বোঝা যেত না।

২. ইয়ারজি'না (يرجعن):

- **শাব্দিক বিশ্লেষণ:** শব্দটি 'দরব' বাব থেকে ফে'লে মুজারে, জমা মুয়ান্নাস গায়েব। মূলধাতু (রা-জিম-আইন)।
- **অর্থ:** তারা ফিরে যেতেন।
- **তাৎপর্য:** এখানে 'ফিরে যাওয়া'র উল্লেখ প্রমাণ করে যে, নারীরা নামাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদে বসে থাকতেন না বা গল্পগুজব করতেন না। বরং জামাত শেষ হওয়া মাত্রই দ্রুত বাড়ির দিকে রওয়ানা হতেন, যাতে আলো ফোটার আগেই তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারেন। এটি নারীদের জন্য মসজিদের শিষ্টাচারও শিক্ষা দেয়।

---

৬. যার ফজরের সুন্নাত ছুটে গেছে, সে কি ফরজের পর পড়বে নাকি সূর্যোদয়ের পর? আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করো। (من فاتته سنة الفجر هل يصلى بعد الفجر ام بعد طلوع الشمس؟ بين اقوال العلماء فيها)

উত্তর:

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ জামাত ধরার জন্য সুন্নাত পড়তে না পারে, তবে তা কখন কাজা করবে—এ নিয়ে মতভেদ আছে।

১. হানাফি মাযহাব:

যদি ফজরের সুন্নাত ছুটে যায়, তবে ফরজের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত কোনো নফল বা সুন্নাত পড়া মাকরুহ। তাই ফরজের পরপরই তা কাজা করা যাবে না।

- **কখন পড়বে?** সূর্য উদিত হয়ে উপরে ওঠার পর (ইশরাকের সময়) তা কাজা করা উত্তম। আর যদি জোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তবে সুন্নাতের কাজা আর করা লাগবে না (যদি না ফরজের সাথে কাজা হয়)।
- **দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন, *"ফজরের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই।"*

২. শাফেয়ি মাযহাব:

ফরজ নামাজের পরপরই ওই সুন্নাত কাজা করা জায়েজ।

- **যুক্তি:** এটি 'কারণবিশিষ্ট নামাজ' (গাইরু জাওয়াতিল আসবাব)। রাসুল (সা.)-এর এক সাহাবি ফজরের পর সুন্নাত পড়ছিলেন, নবীজি (সা.) কারণ জিজ্ঞেস করে চুপ ছিলেন (নিষেধ করেননি)।

৩. ইমাম মালিক ও আহমদ:

সূর্য ওঠার পরেই পড়া উচিত।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাব মতে ফরজের পর না পড়ে সূর্য ওঠার পর পড়াই নিরাপদ এবং হাদিস সম্মত।

---

৭. প্রথম হাদিসটি (আয়েশা রা.) দ্বিতীয় হাদিসের (রাফে রা.) সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় (তাওফিক) কীভাবে করবে? (الحديث الاول يعارض الحديث الثاني فما التوفيق بينهما ؟)

উত্তর:

সাংঘর্ষিকতা:

আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বলছে—নামাজ অন্ধকারে (গালাস) শেষ হতো।
রাফে (রা.)-এর হাদিস বলছে—নামাজ ফর্সা করে (ইসফার) পড়লে সওয়াব বেশি।
আপাতদৃষ্টিতে একটি হাদিস অন্ধকারের পক্ষে, অন্যটি আলোর পক্ষে।
সমন্বয় (তাওফিক) - হানাফি দৃষ্টিভঙ্গি:
হানাফি ফকিহগণ উভয় হাদিসের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় করেছেন:
১. শুরু ও শেষ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজ শুরু করতেন অন্ধকারে (আয়েশা রা.-এর হাদিস অনুযায়ী)। আর তিনি কেরাত এত দীর্ঘ করতেন এবং ধীরে পড়তেন যে, নামাজ শেষ হতে হতে আকাশ ফর্সা হয়ে যেত (রাফে রা.-এর হাদিস অনুযায়ী)। এভাবে উভয় হাদিসের ওপর আমল হয়।
২. ইসফার অর্থ নিশ্চিত হওয়া: 'ইসফার'-এর অর্থ পূর্ণ দিনের আলো নয়, বরং সুবহে সাদিক সম্পর্কে 'নিশ্চিত হওয়া'। অর্থাৎ সন্দেহের সময় নামাজ না পড়ে, ভোর হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে নামাজ পড়া।
৩. পুরুষ ও নারী: অন্ধকার নারীদের জন্য উত্তম (পর্দার জন্য), আর ফর্সা করা পুরুষদের জন্য উত্তম (জামাত বড় হওয়ার জন্য)।

---

৮. আয়েশা (রা.)-এর হাদিস প্রমাণ করে নবীজি (সা.) অন্ধকারে ফজর পড়তেন। হানাফিগণ কেন এই হাদিসের ওপর আমল করেন না? এবং তারা কী দলিল দেন? (حديث عائشة (رض) يدل على أن النبي ﷺ كان يصلى صلوة الفجر في الغلس - فلم لم يعمل الاحناف بهذا الحديث؟ وبم استدلوا؟)

উত্তর:
হানাফিদের অবস্থান:
হানাফিগণ আয়েশা (রা.)-এর হাদিস পরিত্যাগ করেননি, বরং তাঁরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি নামাজের শুরুর সময় নির্দেশ করে, আর রাফে (রা.)-এর হাদিসটি নামাজের গুণগত মান ও সমাপ্তির সময় নির্দেশ করে।
কেন হানাফিগণ 'ইসফার'কে প্রাধান্য দেন?

১. হাদিসের শব্দ: রাফে (রা.)-এর হাদিসে রাসুল (সা.) পরিষ্কার শব্দে আদেশ দিয়েছেন "আসফিরু" (ফর্সা করো) এবং বলেছেন এতে "আজমুল আজর" (সবচেয়ে বেশি সওয়াব)। আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি 'ফে'লি' (কর্মগত), আর রাফে (রা.)-এর হাদিসটি 'কাউলি' (বাচনিক)। উসুলের নীতি অনুযায়ী, বাচনিক নির্দেশ কর্মগত হাদিসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী (কারণ কর্মটি বিশেষ পরিস্থিতির জন্যও হতে পারে)।
২. জামাতের সুবিধা: ফর্সা করলে দূরের মুসল্লিরা জামাতে শরিক হতে পারে, যা ইসলামে কাম্য।
৩. সতর্কতা: অন্ধকারের সময় সুবহে সাদিক নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ফর্সা হলে ওয়াক্ত নিশ্চিত হওয়া যায়।
সুতরাং, হানাফিগণ রাফে (রা.)-এর হাদিসকে 'নাসিখ' (রহিতকারী) বা 'অগ্রগণ্য' মনে করেন না, বরং ব্যাখ্যামূলক মনে করেন।

---

৯. ফজরের মুস্তাহাব সময় নির্ধারণে আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করো। (بين اختلاف العلماء في تعيين الوقت المستحب في الفجر)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এটি ১ নং প্রশ্নের অনুরূপ, এখানে সংক্ষেপে মূল পয়েন্ট দেওয়া হলো)

- **ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ:** 'তাগলিস' বা অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। কারণ এটি দ্রুত নেক কাজে অংশগ্রহণের প্রমাণ।
- **ইমাম আবু হানিফা:** 'ইসফার' বা ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব। কারণ এতে সওয়াব বেশি এবং জামাত বড় হয়।
- **ইমাম তাহাবি:** পুরুষদের জন্য ইসফার এবং নারীদের জন্য (যদি তারা জামাতে পড়ত) তাগলিস উত্তম। অথবা, শুরু অন্ধকারে এবং শেষ আলোতে—এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি।

---

১০. 'গালাস' ও 'ইসফার' এর অর্থ কী? (ما معنى الغلس والاسفار؟)

উত্তর:

১. গালাস (الغلس):

- আভিধানিক অর্থ: রাতের শেষ ভাগের অন্ধকার যা ভোরের আলোর সাথে মিশে থাকে।
- পারিভাষিক অর্থ: সুবহে সাদিকের ঠিক পরের সময়, যখনো ভোরের আলো স্পষ্টভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি এবং অন্ধকার প্রবল থাকে।

২. **ইসফার (الإسفار):**

- আভিধানিক অর্থ: অনাবৃত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, ছড়িয়ে পড়া। যেমন বলা হয় 'আসফারাস সুবহে' (সকাল উজ্জ্বল হয়েছে)।
- পারিভাষিক অর্থ: ফজরের ওয়াক্তের এমন সময় যখন ভোরের আলো পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ একে অপরকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারে, কিন্তু সূর্যোদয় হয় না।

---

১১. দলিলসহ ফজর ও আসর নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করো। (بين اهمية صلوة الفجر والعصر بالادلة)

উত্তর:

(এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী সেটেও ছিল, এখানে সংক্ষেপে)

ফজর ও আসর—এই দুই নামাজকে হাদিসে 'বারদাইন' বলা হয়েছে।

১. ফেরেশতাদের সাক্ষ্য: "ফেরেশতারা ফজর ও আসরে একত্রিত হন এবং আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেন।"

২. জান্নাতের চাবি: "যে বারদাইন (ফজর ও আসর) পড়বে, সে জান্নাতে যাবে।" (বুখারি)

৩. মুনাফিকি থেকে মুক্তি: ফজরের নামাজ মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী। তাই এটি পড়া ঈমানের মজবুত হওয়ার দলিল।

---

১২. আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি হানাফিদের নিকট কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (ما هو محل حديث عائشة عند الاحناف ؟)

উত্তর:

হানাফি মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটির 'মহল' বা প্রয়োগক্ষেত্র হলো তিনটি:

১. নারীদের জন্য: হাদিসে 'নিসা' (নারীরা) শব্দটি এসেছে। তাই হানাফিরা বলেন, নারীদের জন্য অন্ধকারে নামাজ পড়া (ঘরে) উত্তম, যাতে পর্দা রক্ষা হয়।
২. শুরুর সময়: হাদিসটি নামাজের শুরুর অবস্থা বর্ণনা করছে। অর্থাৎ শুরুটা অন্ধকারে হতো।
৩. হজ্জের সময়: মুজদালিফায় ফজরের নামাজ খুব ভোরে অন্ধকারে পড়া হানাফি মতেও সুন্নাত। এই হাদিসটি সেই বিশেষ বিধানের দলিল হতে পারে।

---

১৩. হাদিসে "কাউকে চেনা যেত না"—এখানে 'চেনা' (মা'রিফা) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে যা নাকচ করা হয়েছে? (ما المراد بالمعرفة المنفية في الحديث؟)

উত্তর:
হাদিসে বলা হয়েছে "লা ইয়ারিফুহুন্না আহাদ" (তাদের কেউ চিনতে পারত না)। এখানে 'চেনা না যাওয়া'র দুটি ব্যাখ্যা আছে:

১. **ব্যক্তি সত্তাকে না চেনা (Identity):** অর্থাৎ তারা এত ভালো করে চাদর মুড়ি দিয়ে রাখতেন যে, কে কোন নারী—তা বোঝা যেত না। এর কারণ অন্ধকার নয়, বরং তাদের পর্দা। হানাফিগণ এই ব্যাখ্যা দেন। কারণ অন্য হাদিসে এসেছে সাহাবিরা নামাজ শেষে পাশের লোকের মুখ চিনতে পারতেন।

২. **মুখাবয়ব না দেখা (Visibility):** অর্থাৎ অন্ধকার এত বেশি ছিল যে, আলো না থাকায় কাউকে দেখা বা চেনা সম্ভব ছিল না। শাফেয়িগণ এই ব্যাখ্যা দেন 'তাগলিস' প্রমাণ করার জন্য।
হানাফিদের মতে, প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক, কারণ হাদিসে "মুতালাফফিআত" (চাদর মুড়ি দেওয়া) শব্দটির পরই "চেনা যেত না" বলা হয়েছে, যা পর্দার দিকে ইঙ্গিত করে।

---

১৪. উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (بين نبذة من حياة أم المؤمنين عائشة (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ। পিতা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। মাতা উম্মে রুমান। তিনি 'সিদ্দিকা' ও 'হুমায়রা' লকব বা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

বিবাহ ও রাসুলের সান্নিধ্য:

হিজরতের আগে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং হিজরতের পর মদিনায় তিনি স্বামীর ঘরে আসেন। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী এবং সর্বাধিক প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনী।

জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য:

তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং মুফতি। ইলমে হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আরবি সাহিত্য এবং চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। বড় বড় সাহাবিরা জটিল মাসআলার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতেন। তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা সাহাবিদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৭ হিজরি মতান্তরে ৫৮ হিজরির রমজান মাসে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

11- عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون إبهاها ماه قريبا من شحمتي أذنيه –

وعن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- الحديث الأول يخالف الحديث الثاني فكيف التوفيق بينهما؟ بين -

2- بين مذاهب الأئمة في رفع اليدين بالدلائل الواضحة –

3- ما هو الاختلاف بين العلماء في مقدار الرفع؟ بين بالدلائل –

4- هذا الاختلاف في الافضلية ام في الجواز وعدم الجواز؟ بين موضحا –

5- بين قصة المناظرة مع ابي حنيفة (رح) والأوزاعي في امر رفع اليدين بالتفصيل –

6- ما معنى السجدة لغة وشرعا ؟

7- بين حكم ترك الصلوة –

8- تحدث عن أثر الصلوة في حياة المسلم –

9- ما معنى الركوع لغة وشرعا ؟

10- اذكر شروط الصلوة بالتوضيح –

11- اذكر نبذة من سيرة براء بن عازب (رض) -

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون إبهاها ماه قريبا من شحمتي أذنيه.

মূল হাদিস (২):

وعن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যা তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তোলার সীমা (কান পর্যন্ত) নির্ধারণে হানাফি মাযহাবের দলিল। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনান (হাদিস নং ৭৫৮), ইমাম নাসায়ি এবং ইমাম তাহাবি (রহ.) সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয় হাদিসটি হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। এটি ইমাম আবু দাউদ (হাদিস নং ৭২৬), নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ সংকলন করেছেন।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

নামাজ শুরু করার সময় 'রাফউল ইয়াদাইন' বা দুই হাত তোলা সুন্নাত। কিন্তু হাত কতটুকু উঁচুতে তুলতে হবে—কাঁধ পর্যন্ত না কান পর্যন্ত? এবং রুকু-সিজদায় যাওয়ার সময় হাত তুলতে হবে কি না? এই মাসআলাগুলো পরিষ্কার করার জন্য হাদিস দুটি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবিরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজের নিখুঁত বিবরণ দিতে গিয়ে হাতের অবস্থানের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো উল্লেখ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নামাজের শুরুর তাকবির (তাকবিরে তাহরিমা) বলতেন, তখন তিনি নিজের দুই হাত এমনভাবে উঠাতেন যে, তাঁর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর কানের লতির নিকটবর্তী হয়ে যেত।

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে এলাম। অতঃপর আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি যখন তাকবির বললেন, যখন (রুকু থেকে) মাথা উঠালেন এবং যখন সিজদা করলেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাত কানের বরাবর উঠালেন।

ব্যাখ্যা:

- **কানের লতি (শাহমাতি উজুনাইহি):** বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর হাদিস প্রমাণ করে হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে। এটি হানাফি মাযহাবের দলিল।

- **সিজদায় হাত তোলা:** ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর হাদিসে 'সিজদা'র সময় হাত তোলার কথা আছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে এটি 'শাজ' (বিচ্ছিন্ন) বর্ণনা বা এটি দ্বারা তাকবির বলা উদ্দেশ্য, হাত তোলা নয়। অথবা এটি মানসুখ (রহিত)।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজের শুরুতে তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তোলা সুন্নাত। হাতের উচ্চতা হবে কানের লতি বরাবর (পুরুষদের জন্য)।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. প্রথম হাদিসটি দ্বিতীয় হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে (হাতের উচ্চতা নিয়ে)। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় (তাওফিক) কীভাবে করবে? (الحديث الأول يخالف الحديث الثاني فكيف التوفيق بينهما؟ بين)

উত্তর:

আপাত বিরোধ (তাআরুজ):

- প্রথম হাদিসে (বারা ইবনে আযিব রা.) বলা হয়েছে: "বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতির নিকটবর্তী হতো" (قريبا من شحمتي أذنيه)।
- দ্বিতীয় হাদিসে (ওয়াইল ইবনে হুজর রা.) বলা হয়েছে: "দুই হাত কানের বরাবর হতো" (حذاء أذنيه)।

অন্য বর্ণনায় (ইবনে ওমরের হাদিস) এসেছে: "কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন" (حذو منكبيه)।

এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার কারণে হাতের উচ্চতা নিয়ে একটি আপাত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সমন্বয় ও সমাধান (তাওফিক):

মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ এই হাদিসগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ মনে করেন না। বরং তাঁরা বলেন, প্রতিটি বর্ণনাই সঠিক এবং একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন চিত্রায়ণ। এর সমন্বয় কয়েকটি উপায়ে করা যায়:

১. পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির বিবরণ:

হাত তোলার সময় হাতের তালু থাকবে কাঁধ বরাবর, বৃদ্ধাঙ্গুলি থাকবে কানের লতি বরাবর এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ থাকবে কানের উপরের অংশ বরাবর। সুতরাং, যিনি বলেছেন 'কাঁধ পর্যন্ত', তিনি তালুর কথা বলেছেন। যিনি বলেছেন 'কানের লতি পর্যন্ত', তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির কথা বলেছেন। আর যিনি বলেছেন 'কান পর্যন্ত', তিনি আঙ্গুলের ডগার কথা বলেছেন। অর্থাৎ একই সময়ে তিনটি হাদিসের ওপর আমল হয়ে যায়।

২. অবস্থার ভিন্নতা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) সব সময় একই উচ্চতায় হাত তুলতেন না। কখনো তিনি হাত বেশি উঠাতেন (কান পর্যন্ত), আবার কখনো চাদর গায়ে থাকার কারণে বা শীতের কারণে একটু কম উঠাতেন (কাঁধ পর্যন্ত)। বারা ইবনে আযিব (রা.) এবং ওয়াইল (রা.) উভয়েই যা দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন।

৩. নারী ও পুরুষের পার্থক্য:

হানাফি মাযহাব মতে, কান পর্যন্ত হাত তোলা পুরুষদের জন্য সুন্নাত (বারা ইবনে আযিবের হাদিস)। আর কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলা নারীদের জন্য সুন্নাত (পর্দার স্বার্থে)। এভাবে হাদিসগুলোর প্রায়োগিক ক্ষেত্র ভিন্ন।

---

২. হাত তোলা বা 'রাফউল ইয়াদাইন'-এর স্থানসমূহ নিয়ে ইমামগণের মাযহাব স্পষ্ট দলিলসহ বর্ণনা করো। (بين مذاهب الأئمة في رفع اليدين بالدلائل الواضحة)

উত্তর:

নামাজে কোন কোন স্থানে হাত তুলতে হবে (রাফউল ইয়াদাইন), তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। মূলত দুটি পক্ষ দেখা যায়:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

শুধুমাত্র নামাজের শুরুতে **'তাকবিরে তাহরিমা'**র সময় হাত তোলা সুন্নাত। রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় বা সিজদায় যাওয়ার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয় (বরং মাকরুহ বা মানসুখ)।

- **দলিল ১:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন:

أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

অর্থ: আমি কি তোমাদের রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজ পড়ে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন এবং প্রথমবার (তাকবিরে তাহরিমা) ছাড়া আর কোথাও হাত তুললেন না। (তিরমিজি, নাসায়ি)

- **দলিল ২:** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) সাহাবিদের বারবার হাত তুলতে দেখে বলেছিলেন: *"তোমাদের কী হলো যে আমি তোমাদের অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাতে দেখছি? নামাজে শান্ত থাকো।"* (সহিহ মুসলিম)

২. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.) এবং জুমহুর:

তাঁদের মতে, নামাজে মোট ৩ বা ৪টি স্থানে হাত তোলা সুন্নাত: ১. তাকবিরে তাহরিমা, ২. রুকুতে যাওয়ার সময়, ৩. রুকু থেকে ওঠার সময়, ৪. (কারো মতে) তৃতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর সময়।

- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ... وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ ذَلِكَ

অর্থ: আমি রাসুল (সা.)-কে দেখেছি, নামাজ শুরুর সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি হাত তুলতেন। (সহিহ বুখারি)

হানাফি জবাব: হানাফিগণ বলেন, ইবনে ওমরের হাদিসটি আমলযোগ্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত আমল দ্বারা তা রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। কারণ ইবনে মাসউদ (রা.) শেষ বয়সের আমল বর্ণনা করেছেন।

---

৩. হাত তোলার পরিমাণ (উচ্চতা) নিয়ে আলেমদের মতভেদ দলিলসহ আলোচনা করো। (ما هو الاختلاف بين العلماء في مقدار الرفع؟ بين بالدلائل)

উত্তর:

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত কতটুকু ওপরে উঠাতে হবে, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে দুটি প্রধান মত রয়েছে।

১. হানাফি মাযহাব (কান পর্যন্ত):

পুরুষদের জন্য দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর থাকবে এবং হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে।

- **দলিল ১:** আলোচ্য বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর হাদিস: "তিনি হাত তুলতেন এমনকি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতির নিকটবর্তী হতো।"
- **দলিল ২:** হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) বর্ণিত হাদিস:

حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

অর্থ: এমনকি তিনি হাত দুটি কানের উপরের অংশ বরাবর নিতেন। (সহিহ মুসলিম)

- **যুক্তি:** কানের লতি স্পর্শ করার কথা হাদিসে নেই, বরং বরাবর নেওয়ার কথা আছে। হানাফিরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য লতির কাছে হাত নেন।

২. শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব (কাঁধ পর্যন্ত):

তাঁদের মতে, হাত কাঁধ পর্যন্ত (Mankibain) উঠানো সুন্নাত। অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলের মাথা কাঁধের সমান্তরালে থাকবে।

- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আবু হুমাইদ সাঈদি (রা.) বর্ণিত হাদিস:

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

অর্থ: তিনি তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

সামঞ্জস্য:

হানাফি ফকিহগণ বলেন, ইবনে ওমরের হাদিসের 'কাঁধ পর্যন্ত' অর্থ হলো হাতের তালু কাঁধ বরাবর থাকা, যা কান পর্যন্ত আঙ্গুল তুললে এমনিতেই হয়ে যায়। অথবা, কাঁধ পর্যন্ত তোলার হুকুমটি নারীদের জন্য খাস (বিশেষ), কারণ এটি অধিকতর পর্দার সহায়ক। তাই হানাফি মাযহাবে নারীরা কাঁধ পর্যন্ত এবং পুরুষরা কান পর্যন্ত হাত তুলবে।

---

৪. এই মতভেদ কি উত্তম-অনুত্তমের (আফজালিয়া) নাকি জায়েজ-নাজায়েজের? ব্যাখ্যা করো। (هذا الاختلاف في الافضلية ام في الجواز وعدم الجواز؟ بين موضحا)

উত্তর:

হাত তোলার স্থান (রুকুতে রাফউল ইয়াদাইন) এবং পরিমাণ (কান না কাঁধ পর্যন্ত)—এই বিষয়গুলো নিয়ে ইমামদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তা মূলত 'আফজালিয়া' বা উত্তম-অনুত্তমের মতভেদ, জায়েজ-নাজায়েজের নয়।

ব্যাখ্যা:

১. উভয়টিই জায়েজ:

সকল ফকিহ ও ইমাম একমত যে, যদি কোনো হানাফি ব্যক্তি রুকুতে যাওয়ার সময় হাত তোলে (শাফেয়ি নিয়মে), তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। আবার যদি কোনো শাফেয়ি ব্যক্তি হাত না তোলে (হানাফি নিয়মে), তবুও তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। কারণ রাফউল ইয়াদাইন নামাজের 'রুকন' বা 'শর্ত' নয়, বরং এটি 'সুন্নাত' বা 'হাইয়াত' (আকৃতি)।

২. সুন্নাত কোনটি:

মতভেদের মূল বিষয় হলো—রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ আমল কোনটি ছিল এবং কোনটি বেশি সওয়াবের?

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, হাত না তোলাটাই সুন্নাত এবং উত্তম। কারণ এটি প্রশান্তির পরিচায়ক।
- ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে, হাত তোলাটাই সুন্নাত এবং উত্তম। কারণ এটি ইবনে ওমর (রা.)-এর মতো বড় সাহাবি বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার:

একে অপরের আমলকে বাতিল বা বিদআত বলা উচিত নয়। বরং নিজ মাযহাবের আমলকে 'উত্তম' মনে করে পালন করতে হবে এবং অন্যের আমলকে 'জায়েজ' বা 'বৈধ' মনে করে শ্রদ্ধা করতে হবে। এটিই ফিকহি উদারতা।

---

৫. রুকুতে হাত তোলা (রাফউল ইয়াদাইন) নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মধ্যকার বিতর্কের ঘটনাটি বিস্তারিত লেখ। بين قصة المناظرة مع ابي حنيفة (رح) والأوزاعي في امر رفع اليدين بالتفصيل)

উত্তর:

এই ঐতিহাসিক বিতর্কটি (মুনাজারা) মক্কার পবিত্র ভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং শামের বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মধ্যে এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণ:

মক্কায় এক সাক্ষাতে ইমাম আওযায়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনাদের (ইরাকবাসীদের) কী হলো যে আপনারা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং ওঠার সময় হাত তোলেন না?"

ইমাম আবু হানিফা (রহ.): *"কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে এর সপক্ষে কোনো সহিহ আমল প্রমাণিত নেই (বরং মানসুখ)।"*

ইমাম আওযায়ী: *"কীভাবে প্রমাণিত নেই? অথচ আমাকে যুহরি বর্ণনা করেছেন সালেম থেকে, তিনি তাঁর পিতা (ইবনে ওমর) থেকে, তিনি রাসুল (সা.) থেকে যে, রাসুল (সা.) রুকুতে যাওয়া ও ওঠার সময় হাত তুলতেন।"* (এটি বুখারির হাদিস)।

ইমাম আবু হানিফা: *"আর আমাকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম নাখয়ি থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তাঁরা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কেবল প্রথমবার হাত তুলতেন, এরপর আর তুলতেন না।"*

ইমাম আওযায়ী: *"আমি আপনাকে শোনালাম যুহরি-সালেম-ইবনে ওমরের হাদিস, আর আপনি শোনাচ্ছেন হাম্মাদ-ইব্রাহিমের হাদিস? (অর্থাৎ আমার সনদ তো বেশি শক্তিশালী ও উচ্চমানের)।"*

ইমাম আবু হানিফা (রহ.): *"শুনুন! হাম্মাদ ছিলেন যুহরির চেয়ে বড় ফকিহ। ইব্রাহিম নাখয়ি ছিলেন সালেমের চেয়ে বড় ফকিহ। আর আলকামা তো আলকামাই! (তাঁর তুলনা নেই)। আর যদি ইবনে ওমরের সাহাবি হওয়ার মর্যাদা না থাকত, তবে আমি বলতাম আলকামা ইবনে ওমরের চেয়েও বড় ফকিহ। আর ইবনে মাসউদ তো ইবনে মাসউদই!"*

ফলাফল:

ইমাম আবু হানিফার এই জবাব শুনে ইমাম আওযায়ী চুপ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, আবু হানিফা কেবল হাদিস মুখস্থ করেন না, বরং বর্ণনাকারীদের ফিকহি যোগ্যতা (Jurisprudential Insight) বিচার

করেন। ফকিহ রাবির হাদিস মুহাদ্দিস রাবির হাদিসের চেয়ে ফতোয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়।

---

৬. সিজদার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى السجدة لغة وشرعا ؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'সিজদা' (السجدة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো:

১. নত হওয়া (Inkhifaad): নিজেকে নিচু করা।

২. বিনয় প্রকাশ করা (Tazallul): চূড়ান্ত বিনয় ও আনুগত্য দেখানো।

৩. কপাল মাটিতে রাখা: সম্মানের সাথে মাথা নোয়ানো।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায় সিজদা হলো:

وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّهِ تَعَالَى

অর্থ: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ মাটিতে স্থাপন করা।

নামাজে প্রতি রাকাতে দুটি সিজদা করা ফরজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"বান্দা যখন সিজদা করে, তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"* (সহিহ মুসলিম)।

---

৭. নামাজ ত্যাগকারীর হুকুম বর্ণনা করো। (بين حكم ترك الصلوة)

উত্তর:

ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। তবে নামাজ ত্যাগকারীর হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. অস্বীকারকারী (মুনকির):

যদি কেউ নামাজের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে নামাজ না পড়ে, তবে সকল ইমামের ঐকমত্যে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। সে ইসলাম থেকে খারিজ।

২. অলসতা করে ত্যাগকারী (কাসলান):
যদি কেউ নামাজকে ফরজ বিশ্বাস করে, কিন্তু অলসতা বা অবহেলার কারণে নামাজ পড়ে না—

- **ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.):** তাঁর মতে, ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগকারী কাফের। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তার জানাজা পড়া যাবে না। দলিল: *"বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।"* (মুসলিম)
- **ইমাম শাফেয়ি ও মালিক (রহ.):** সে ফাসিক, কিন্তু কাফের হবে না। তবে শাস্তি হিসেবে তাকে 'হদ' (শরয়ী দণ্ড) হিসেবে **হত্যা (Wajib al-Qatl)** করা হবে, যদি সে তওবা না করে।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:** সে কাফের হবে না, বরং ফাসিক ও গুনাহগার হবে। তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে তাকে **কারারুদ্ধ (Imprisonment)** করে রাখতে হবে এবং প্রহার করতে হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে এবং নামাজ শুরু করে। এটিই হানাফি ফতোয়া।

---

৮. মুমিনের জীবনে নামাজের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো। (تحدث عن أثر الصلوة في حياة المسلم)

উত্তর:
নামাজ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি মুমিনের জীবনের চালিকাশক্তি। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী:
১. পাপাচার থেকে মুক্তি:
আল্লাহ বলেন:
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত: ৪৫)
নামাজী ব্যক্তি দিনে পাঁচবার আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, তাই তার বিবেক তাকে পাপ করতে বাধা দেয়।
২. সময়ের শৃঙ্খলা:

নামাজ মানুষকে সময়ের সঠিক ব্যবহার ও নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়ার অভ্যাস মুমিনকে সময়ানুবর্তী করে তোলে।

৩. পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা:

নামাজের জন্য ওজু, গোসল ও পোশাকের পবিত্রতা জরুরি। এর ফলে মুমিন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, যা সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

৪. সামাজিক সাম্য ও ঐক্য:

জামাতে নামাজ পড়ার সময় রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। এতে সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের শিক্ষা পাওয়া যায়।

৫. মানসিক প্রশান্তি:

নামাজ আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন। এটি হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ দূর করে হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। রাসুল (সা.) বলতেন, "হে বিলাল! নামাজের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্তি দাও।"

---

৯. রুকুর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الركوع لغة وشرعا ؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'রুকু' (الركوع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো:

১. ঝুঁকে পড়া (Inhina): বাঁকা হওয়া।

২. নত হওয়া: সম্মানে মাথা নোয়ানো।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায় রুকু হলো:

هُوَ انْحِنَاءُ الظَّهْرِ حَتَّى تَصِلَ الْيَدَانِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ

অর্থ: মেরুদণ্ড বা পিঠ এমনভাবে বাঁকা করা যাতে দুই হাত হাঁটুর মালাইচাকি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং স্থিরতা অবলম্বন করা।

রুকু নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা ফরজ। রুকু ছাড়া নামাজ হবে না। রুকুতে পিঠ ও মাথা সোজা এক সমান্তরালে রাখা সুন্নাত।

---

১০. নামাজের শর্তাবলি (শারায়েত) বিস্তারিত উল্লেখ করো। (اذكر شروط الصلوة بالتوضيح)

উত্তর:

নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য নামাজের বাইরে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এগুলোকে 'শারায়েতুস সালাত' বা নামাজের শর্ত বলা হয়। হানাফি মাযহাবে এগুলো ৬ বা ৭টি।

১. তাহারাত (পবিত্রতা): শরীর ওজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হতে হবে।

২. সতর ঢাকা (সতরুল আওরাত): পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীর জন্য মুখমণ্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া পুরো শরীর ঢাকা ফরজ।

৩. স্থান ও পোশাকের পবিত্রতা: নামাজের জায়গা এবং পরনের কাপড় নাপাকি থেকে মুক্ত হতে হবে।

৪. কিবলামুখী হওয়া (ইস্তিকবালুল কিবলা): কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

৫. ওয়াক্ত (সময়): নির্দিষ্ট নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় হওয়া। সময়ের আগে নামাজ হবে না।

৬. নিয়ত (আন-নিয়্যাহ): মনে মনে নির্দিষ্ট নামাজের সংকল্প করা।

৭. তাকবিরে তাহরিমা: 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাজ শুরু করা। (অনেকে একে আরকান বা ভেতরের ফরজ ধরেন)।

এই শর্তগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

---

১১. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করো। ((اذكر نبذة من سيرة براء بن عازب (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম বারা, পিতার নাম আযিব। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তাঁর উপনাম 'আবু উমারাহ'। তিনি হিজরতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ:

তিনি বদর যুদ্ধের সময় খুব ছোট ছিলেন, তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এবং ইবনে ওমর (রা.)-কে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। তিনি উহুদ যুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধে (মোট ১৪ বা ১৫টি) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও হাদিস বর্ণনা:

তিনি একজন বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি ছিলেন। তাঁর থেকে ৩০৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদিসগুলো বুখারি ও মুসলিমে স্থান পেয়েছে। তিনি নামাজের নিয়মাবলী এবং হজ্জের বিধান বর্ণনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন।

বীরত্ব ও পরবর্তী জীবন:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি কুফায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি পারস্য বিজয়ে (রায় ও তুসতরের যুদ্ধে) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে জামাল, সিফফাইন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৭২ হিজরি সনে কুফায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের বেশি। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

12- عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الفجر فتعايت عليه القراءة فلما سلم قال اتقرؤون خلفي؟ قلنا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه صلوة لمن لم يقرأ بها– .

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام عند الأحناف (رح) ؟ بين بالادلة –

2- بين اختلاف الأئمة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام مفصلا -

3- اكتب ثلاثة أحاديث اخرى يستدل بها الائمة الثلاثة على وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام–

4- اذكر مقدار وجوب القراءة للصلوة الفريضة والنوافل وهل تكون القراءة فريضة في الركعتين الآخرين في الصلوة الفريضة أم المستحبة؟

5- تحدث عن النظر" الذي ذكره الامام الطحاوي في سقوط قراءة الفاتحة –

6- رواية ابي هريرة تدل على عدم فرضية الفاتحة والحديث المذكور يدل على فرضية الفاتحة – فما هو التوفيق بينهما؟ وما هو المختار عندك ؟

7- كم عدد ايات سورة الفاتحة؟ وهل البسملة منها؟

8- اكتب بعض اســـاء وفضائل سورة الفاتحة –

9- ما هو حكم ضم سورة من القرآن والقراءة الفاتحة في الصلوة وما الاختلاف فيه بين الائمة؟ بين بالادلة –

10- بين مقدار فرض القراءة في الصلوة –

11- اجمع العلماء على ان من خلف الامام يقرءون الادعية المأثورة والتكبيرات والتسبيحات فلم لا يقرون الفاتحة ؟

12-قال تعالى "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هل الأية خاص لمن سمع قراءة الامام ام عام سمع او لم يسمع؟ بين موضحا۔

13-بم استدل الامام البخاري (رح) على وجوب القراءة للامام والماموم فى الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت؟

14-هل يجوز اقتداء الشافعي خلف الحنفي وبالعكس مع اختلافهم في وجوب القراءة وعدمه؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الفجر فتعايت عليه القراءة فلما سلم قال اتقرؤون خلفي؟ قلنا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه صلوة لمن لم يقرأ بها.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ইমাম বা মুক্তাদি সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠের আবশ্যকতা বিষয়ক শাফেয়ি ও অন্যান্য মাযহাবের প্রধান দলিল। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৮২৩), ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর সুনান (হাদিস নং ৩১১) এবং ইমাম আহমদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'হাসান' বা 'সহিহ' হিসেবে গণ্য।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

ফজরের নামাজে কেরাত পাঠের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ, মুক্তাদি সাহাবিরা রাসুল (সা.)-এর সাথে সাথে উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে কুরআন পাঠ করছিলেন। এতে আওয়াজের সংমিশ্রণ ঘটছিল। নামাজ শেষে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের সতর্ক করার জন্য এই নির্দেশ দেন। এই প্রেক্ষাপটেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজে তাঁর জন্য কুরআন পাঠ করা কষ্টকর (দ্বিধাগ্রস্ত) হয়ে পড়ল। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন বললেন: "তোমরা কি আমার পেছনে কেরাত পাঠ করছিলে?" আমরা বললাম, "জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন: "তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ব্যতীত অন্য কিছু পড়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি তা (ফাতিহা) পাঠ করে না, তার নামাজ হয় না।"

ব্যাখ্যা:

- **ফাতিহা ব্যতীত:** এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, ইমামের পেছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে, কিন্তু অন্য সূরা পড়বে না। এটি শাফেয়ি মাযহাবের দলিল।
- **লা সালাতা (নামাজ নেই):** শাফেয়ি মতে এর অর্থ 'নামাজ বাতিল'। আর হানাফি মতে এর অর্থ 'নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয় না'। হানাফিগণ মনে করেন, এই হাদিসটি ইসলামের শুরুর দিকের, যখন কথা বলা বা পড়া নিষিদ্ধ হয়নি। পরবর্তীতে কুরআনের আয়াত "যখন কুরআন পড়া হয় তখন চুপ থাকো" নাজিল হওয়ার পর এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিসকে কেন্দ্র করে 'কিরাআত খলফাল ইমাম' বা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার মাসআলায় বড় ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। শাফেয়িদের মতে ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ফরজ, আর হানাফিদের মতে তা নাজায়েজ বা মাকরুহ তাহরিমি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. হানাফি মাযহাব মতে ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম কী? দলিলসহ বর্ণনা করো। (ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام عند الأحناف (رح) ؟ بين بالادلة)

উত্তর:

হানাফি মাযহাবের বিধান:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি মাযহাবের চূড়ান্ত ফতোয়া অনুযায়ী, ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পাঠ করা মাকরুহ তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি নিষিদ্ধ)। নামাজ জাহরি (উচ্চস্বরে) হোক বা সিররি (নিচুস্বরে), ইমামের পেছনে মুক্তাদি সম্পূর্ণ চুপ থাকবে এবং ইমামের কেরাত মনোযোগ দিয়ে শুনবে (যদি আওয়াজ আসে) অথবা নীরব থাকবে (যদি আওয়াজ না আসে)।

দলিলসমূহ:

১. কুরআনের আয়াত:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: যখন কুরআন পাঠ করা হয় (নামাজে), তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়। (সূরা আরাফ: ২০৪)

এই আয়াতটি হানাফিদের অকাট্য দলিল। এখানে 'শোনো' এবং 'চুপ থাকো'—উভয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থ: যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার (মুক্তাদির) কেরাত হিসেবে গণ্য হবে। (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

৩. অন্য হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ... وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

অর্থ: ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য... যখন তিনি কেরাত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাকো। (সহিহ মুসলিম)

যুক্তি: জামাতে ইমাম হলেন সবার প্রতিনিধি (Leader)। প্রতিনিধি যখন কাজ করেন, তখন দলের সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। ইমামের ফাতিহা পড়াই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

২. ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ার আবশ্যকতা নিয়ে ইমামগণের মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করো। (بين اختلاف الأئمة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام مفصلا)

উত্তর:

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া কি ওয়াজিব, নাকি নিষিদ্ধ—এ বিষয়ে ফকিহদের তিনটি প্রধান মত রয়েছে:

১. প্রথম মত: পড়া ওয়াজিব (শাফেয়ি ও হাম্বলি - এক মত):

ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ (রহ.) এবং ইমাম বুখারি (রহ.)-এর মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ বা ওয়াজিব। নামাজ জাহরি হোক বা সিররি, ফাতিহা পড়তেই হবে। না পড়লে নামাজ হবে না।

- **দলিল:** আলোচ্য উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদিস: *"ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই"* এবং *"ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়ো না"*। তাঁরা বলেন, হাদিসটি 'আম' (ব্যাপক), ইমাম-মুক্তাদি সবার জন্য প্রযোজ্য।

২. দ্বিতীয় মত: পড়া নিষিদ্ধ (হানাফি):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ইমামের পেছনে কোনো অবস্থাতেই (জাহরি বা সিররি) ফাতিহা পড়া যাবে না। পড়লে গুনাহ হবে এবং নামাজ মাকরুহ হবে।

- **দলিল:** কুরআনের আয়াত "চুপ থাকো" এবং হাদিস "ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত"।

৩. তৃতীয় মত: বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ (মালিকি ও হাম্বলি - অন্য মত):

ইমাম মালিক (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী:

- **জাহরি নামাজে (ফজর, মাগরিব, এশা):** ইমামের কেরাত শোনা গেলে পড়া যাবে না, চুপ থাকতে হবে।
- **সিররি নামাজে (জোহর, আসর):** যেহেতু ইমামের আওয়াজ শোনা যায় না, তাই মুক্তাদি মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে।

- **যুক্তি:** কুরআনের আয়াতে 'শোনো' বলা হয়েছে। সিররি নামাজে শোনার সুযোগ নেই, তাই সেখানে পড়ার অনুমতি আছে।

উপসংহার: হানাফি মাযহাবের মতটি কুরআনের আয়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা অধিক শক্তিশালী মনে করা হয়, তবে শাফেয়ি মাযহাবের মতটি হাদিসের ওপর ভিত্তি করে সতর্কতামূলক।

---

৩. ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে অন্য তিনটি হাদিস লেখ যা তিন ইমাম দলিল হিসেবে পেশ করেন। (اكتب ثلاثة أحاديث اخرى يستدل بها الائمة الثلاثة على وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام)

উত্তর:

শাফেয়ি ও অন্য ইমামগণ উবাদা বিন সামিতের হাদিস ছাড়াও আরও যে তিনটি হাদিস দ্বারা ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করেন, সেগুলো হলো:

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (ثَلَاثًا) غَيْرُ تَمَامٍ

অর্থ: যে ব্যক্তি নামাজ পড়ল কিন্তু তাতে উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পড়ল না, তার নামাজ অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ (ত্রুটিপূর্ণ)।

তখন আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "আমরা যদি ইমামের পেছনে থাকি?" তিনি বললেন: "ইকরা' বিহা ফি নাফসিক" (তুমি তা মনে মনে পড়ো)। (সহিহ মুসলিম)

২. সাধারণ নির্দেশমূলক হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার কোনো নামাজ নেই। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

শাফেয়িগণ বলেন, এখানে 'মান' (যে ব্যক্তি) শব্দটি ব্যাপক। এটি ইমাম, মুনফারিদ (একাকী) এবং মুক্তাদি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. বেদুইনকে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার হাদিস:
রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে ভুল নামাজ পড়তে দেখে বলেছিলেন:
ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
অর্থ: অতঃপর তোমার সাথে কুরআনের যা সহজ হয় তা পাঠ করো।
(বুখারি ও মুসলিম)
অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে: "অতঃপর তুমি উম্মুল কুরআন পড়ো।"
এই নির্দেশটি নামাজের রুকন বা ফরজ হওয়ার দলিল।

---

৪. ফরজ ও নফল নামাজে কেরাত পড়ার ওয়াজিব পরিমাণ কতটুকু? এবং ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে কেরাত পড়া কি ফরজ নাকি মুস্তাহাব? (اذكر مقدار وجوب القراءة للصلوة الفريضة والنوافل وهل تكون القراءة فريضة في الركعتين الآخرين في الصلوة الفريضة أم المستحبة؟)

উত্তর:

কেরাত পড়ার ওয়াজিব পরিমাণ:

- **হানাফি মাযহাব:** ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং নফল/বিতর নামাজের প্রতিটি রাকাতে কমপক্ষে **একটি বড় আয়াত** (যা ছোট তিন আয়াতের সমান) অথবা **ছোট তিনটি আয়াত** পড়া ওয়াজিব। তবে পূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এবং এর সাথে অন্য সূরা মেলানোও ওয়াজিব। শুধু 'সূরা ফাতিহা' পড়া ফরজ নয়, বরং কুরআনের যেকোনো অংশ পড়লেই 'ফরজ' আদায় হবে, কিন্তু ফাতিহা বাদ দিলে ওয়াজিব তরক হবে।
    - দলিল: *"ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন"* (কুরআন থেকে যা সহজ হয় পড়ো)।
- **শাফেয়ি মাযহাব:** প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া **ফরজ (রুকন)**। বিসমিল্লাহসহ ফাতিহা পড়তে হবে।

ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে কেরাতের হুকুম:

- **হানাফি মাযহাব:** চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে (৩য় ও ৪র্থ) কেরাত পড়া **সুন্নাত বা মুস্তাহাব**, ফরজ বা

ওয়াজিব নয়। এই দুই রাকাতে মুসল্লি চাইলে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে, চাইলে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারে, আবার চাইলে চুপ করেও থাকতে পারে। তবে ফাতিহা পড়া উত্তম।

- দলিল: হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) শেষ দুই রাকাতে কখনো পড়তেন, কখনো চুপ থাকতেন।

- **শাফেয়ি মাযহাব:** শেষ দুই রাকাতেও সূরা ফাতিহা পড়া **ফরজ (রুকন)**। না পড়লে নামাজ বাতিল হবে।

নফল ও বিতর:

সকল মাযহাবে নফল ও বিতর নামাজের প্রতিটি রাকাতেই সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। কারণ নফলের প্রতিটি দুই রাকাতই স্বতন্ত্র নামাজের মতো।

---

৫. ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম তাহাবি (রহ.) যে "নজর" বা যৌক্তিক দলিলে উল্লেখ করেছেন, তা আলোচনা করো। (تحدث عن النظر" الذي ذكره الامام الطحاوي في سقوط قراءة الفاتحة)

উত্তর:

ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শরহু মাআনিল আসার'-এ ইমামের পেছনে ফাতিহা না পড়ার পক্ষে হাদিসের পাশাপাশি 'নজর' বা কিয়াসি (যৌক্তিক) দলিল পেশ করেছেন। তাঁর যুক্তিটি অত্যন্ত শক্তিশালী।

তাহাবি (রহ.)-এর যুক্তি (আন-নজর):

তিনি বলেন, আমরা নামাজের দিকে তাকালে দেখি যে, মুক্তাদির ওপর এমন অনেক আমল রহিত হয়ে যায় যা ইমাম আদায় করেন। যেমন:

১. তাশাহহুদ: মুক্তাদি ইমামের সাথে তাশাহহুদ পড়ে।

২. অন্য সূরা: সকলে একমত যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদি ফাতিহার পরের সূরা (সূরা মিলানো) পড়বে না। ইমামের পড়াই তার জন্য যথেষ্ট।

৩. সেহরি/ভুল: ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির সিজদা সাহু করতে হয়, মুক্তাদি ভুল করলে কিছুই করতে হয় না।

মূল যুক্তি:
ইমাম তাহাবি বলেন, যেহেতু সর্বসম্মতভাবে ইমামের পেছনের সূরা (কুরআন পাঠ) মাফ হয়ে গেছে এবং ইমামের কেরাতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হয়েছে, ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহাও কুরআনেরই একটি অংশ। তাই যুক্তির দাবি হলো—অন্য সূরা যেমন ইমাম পড়লে মুক্তাদির পড়া লাগে না, তেমনি ফাতিহা ইমাম পড়লে মুক্তাদির পড়া লাগবে না। ফাতিহা এবং অন্য সূরার মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সহিহ দলিল বা যুক্তি নেই।
যেমন ইমামের জোরে পড়ার সময় মুক্তাদি চুপ থাকে, তেমনি ইমামের আস্তে পড়ার সময়ও (যুক্তি অনুযায়ী) মুক্তাদির চুপ থাকা উচিত, কারণ ইমাম তার প্রতিনিধি।

---

৬. আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস প্রমাণ করে ফাতিহা ফরজ নয় (কারণ তিনি মনে মনে পড়তে বলেছেন), আর আলোচ্য হাদিস প্রমাণ করে ফাতিহা ফরজ। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় কী? আপনার মতে গ্রহণযোগ্য মত কোনটি? (رواية ابي هريرة تدل على عدم فرضية الفاتحة والحديث المذكور يدل على فرضية الفاتحة – فما هو التوفيق بينهما؟ وما هو المختار عندك ؟)

উত্তর:

বিরোধ (Conflict):

- উবাদা বিন সামিতের হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, *"ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই"* এবং *"তোমরা আমার পেছনে পড়বে না, তবে ফাতিহা ছাড়া।"* এটি প্রমাণ করে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বা ফরজ।
- আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, *"যে নামাজে ফাতিহা পড়া হয় না তা অসম্পূর্ণ।"* অসম্পূর্ণ মানে বাতিল নয়। এবং আবু হুরায়রা (রা.) মুক্তাদিকে বলেছেন *"মনে মনে পড়ো"*। সাহাবির নিজস্ব ইজতিহাদ ফরজ সাব্যস্ত করতে পারে না।

সমন্বয় (তাওফিক) - হানাফি দৃষ্টিভঙ্গি:

১. নাফি আল-কামাল: "ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই"—এর অর্থ হলো নামাজের পূর্ণাঙ্গতা নেই (লা সালাতা কামিলাতা)। যেমন বলা হয় "মসজিদের প্রতিবেশী ছাড়া মসজিদে নামাজ নেই"। এর মানে নামাজ বাতিল নয়, বরং ফজিলত কম। তাই ফাতিহা না পড়লে নামাজ মাকরুহ হবে, কিন্তু বাতিল হবে না।
২. মানসুখ (রহিত): উবাদা (রা.)-এর হাদিসটি ছিল ইসলামের শুরুর দিকের। তখন ইমামের পেছনে পড়ার অনুমতি ছিল। পরে সূরা আরাফের ২০৪ নং আয়াত এবং "ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত" হাদিস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। রাসুল (সা.) শেষ জীবনে সাহাবিদের চুপ থাকতে বলেছেন।
আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত (আল-মুখতার):
হানাফি মাযহাবের মতটিই অধিক শক্তিশালী। কারণ কুরআনের আয়াত "ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু" (শোনো এবং চুপ থাকো) একটি অকাট্য দলিল। হাদিস দ্বারা কুরআনের আয়াত বাতিল করা যায় না। তাই ইমামের পেছনে চুপ থাকাই নিরাপদ এবং আদব। আর "লা সালাতা" হাদিসটি ইমাম ও একাকী নামাজীর জন্য প্রযোজ্য।

---

৭. সূরা ফাতিহার আয়াতের সংখ্যা কত? এবং 'বিসমিল্লাহ' কি এর অংশ? (كم عدد ايات سورة الفاتحة؟ وهل البسملة منها؟)

উত্তর:
সূরা ফাতিহার আয়াতের সংখ্যা সর্বসম্মতভাবে ৭টি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি আপনাকে সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত (সাব'উল মাসানি) দান করেছি।" (সূরা হিজর: ৮৭)।
'বিসমিল্লাহ' কি ফাতিহার অংশ?
এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:
১. ইমাম শাফেয়ি (রহ.):
'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত। তাই নামাজে এটিও জোরে (জাহরি নামাজে) পড়া জরুরি। যদি বিসমিল্লাহ বাদ দেওয়া হয়, তবে ৭ আয়াত পূর্ণ হবে না।

- তাদের গণনা: বিসমিল্লাহ (১), আলহামদু... (২)... শিরাতাল্লাজিনা... (৭)।

২. ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.):
'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়, বরং এটি দুটি সূরার মাঝখানে পার্থক্যকারী একটি স্বতন্ত্র আয়াত। সূরা ফাতিহা 'আলহামদুলিল্লাহ' থেকে শুরু হয়।

- তাদের গণনা: আলহামদু... (১)... মালিকি ইয়াউমিদ্দিন (৩)... 'গাইরিল মাগদুবি...' থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা মিলে ৭ম আয়াত।
- **দলিল:** হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন: *"আমি নামাজকে (ফাতিহাকে) আমার ও বান্দার মাঝে ভাগ করেছি। যখন বান্দা বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', তখন আল্লাহ বলেন..."* এখানে বিসমিল্লাহর উল্লেখ নেই।

---

৮. সূরা ফাতিহার কিছু নাম ও ফজিলত লেখ। (اكتب بعض اســـاء وفضائل سورة الفاتحة)

উত্তর:

নামসমূহ:
সূরা ফাতিহার অনেকগুলো নাম রয়েছে, যা এর মর্যাদা প্রমাণ করে।
যেমন:
১. ফাতিহাতুল কিতাব: কিতাবের প্রারম্ভ বা ভূমিকা।
২. উম্মুল কুরআন: কুরআনের জননী বা মূল। কারণ পুরো কুরআনের সারসংক্ষেপ এতে আছে।
৩. আস-সাব'উল মাসানি: বারবার পঠিত সাতটি আয়াত।
৪. আশ-শিফা: রোগ নিরাময়কারী।
৫. আল-কাফিয়া: যথেষ্টকারী।
৬. আল-কানজ: ভাণ্ডার।

ফজিলত:
১. সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর বা কুরআনে এর সমতুল্য কোনো সূরা নাজিল হয়নি।" (তিরমিজি)

২. আল্লাহর সাথে কথোপকথন: হাদিসে কুদসিতে এসেছে, সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহ বান্দার প্রতিটি আয়াতের জবাব দেন।
৩. রোগমুক্তি: এক সাহাবি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন এবং সে সুস্থ হয়েছিল। রাসুল (সা.) একে সমর্থন করেছেন।

---

৯. নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর (দম্মে সূরা) হুকুম কী? এবং এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ কী? (ما هو حكم ضم سورة من القرآن والقراءة الفاتحة في الصلوة وما الاختلاف فيه بين الائمة؟ بين بالادلة)

উত্তর:

নামাজের কেরাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত মিলানোকে 'দম্মে সূরা' বলা হয়।

১. হানাফি মাযহাব:

- **হুকুম:** ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং নফল/বিতর নামাজের সব রাকাতে সূরা মিলানো **ওয়াজিব**।
- যদি কেউ ভুলে সূরা মিলাতে ভুলে যায়, তবে 'সিজদা সাহু' দিতে হবে। আর ইচ্ছাকৃত ছাড়লে নামাজ মাকরুহ তাহরিমি হবে এবং পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিরবচ্ছিন্ন আমল। তিনি সর্বদা ফাতিহার পর সূরা পড়তেন।

২. শাফেয়ি মাযহাব:

- **হুকুম:** সূরা মিলানো **সুন্নাত**। যদি কেউ সূরা না মিলায়, তবুও নামাজ হয়ে যাবে (সিজদা সাহু লাগবে না)। তবে ফাতিহা পড়া ফরজ।

৩. ইমাম মালিক (রহ.):

- তাঁর মতেও সূরা মিলানো সুন্নাত।

সারসংক্ষেপ: হানাফিদের মতে কেরাত (ফাতিহা+সূরা) ওয়াজিবের স্তরের, শাফেয়িদের মতে ফাতিহা রুকন (ফরজ) আর সূরা সুন্নাত।

১০. নামাজে কেরাত পড়ার ফরজ পরিমাণ কতটুকু? (بين مقدار فرض القراءة في الصلوة)

উত্তর:

নামাজে কতটুকু কুরআন পড়লে ফরজ আদায় হয়ে যাবে—এ নিয়ে ইমামদের মতভেদ আছে।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.):

তাঁর মতে, কুরআনের যেকোনো একটি আয়াত (তা ছোট হোক বা বড়) পড়লেই কেরাতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

- **দলিল:** কুরআনের আয়াত *"ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন"* (কুরআন থেকে যা সহজ হয় পড়ো)। এখানে নির্দিষ্ট কোনো সূরার কথা বলা হয়নি।
- তবে ফাতিহা পড়া এবং সূরা মিলানো ওয়াজিব। অর্থাৎ শুধু এক আয়াত পড়লে ফরজ আদায় হবে, কিন্তু ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হবে।

২. সাহিবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) - হানাফি:

তাঁদের মতে, কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পড়া ফরজ। এর কমে পড়লে ফরজ আদায় হবে না।

৩. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.):

তাঁদের মতে, সূরা ফাতিহা পূর্ণ পড়া ফরজ (রুকন)। ফাতিহা না পড়লে কেরাতের ফরজ আদায় হবে না এবং নামাজ বাতিল হবে।

---

১১. ইমামের পেছনে সানা, তাকবির ও তাসবিহ পড়া জায়েজ, কিন্তু ফাতিহা কেন পড়া যাবে না? (اجمع العلماء على ان من خلف الامام يقرءون الادعية المأثورة والتكبيرات والتسبيحات فلم لا يقرون الفاتحة ؟)

উত্তর:

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌক্তিক প্রশ্ন। এর উত্তর ফিকহি মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল।

১. কেরাতের বিশেষ মর্যাদা:
নামাজে কেরাত (কুরআন পাঠ) হলো একটি 'রুকন' বা প্রধান স্তম্ভ। জামাতে এই রুকনটি আদায় করার দায়িত্ব ইমামের ওপর অর্পিত। হাদিসে বলা হয়েছে, "ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত"। কিন্তু তাকবির, তাসবিহ (রুকু-সিজদার দোয়া) বা সানা—এগুলো রুকন নয়, বরং সুন্নাত বা জিকির। ইমাম এগুলো উচ্চস্বরে পড়েন না (তাকবির ছাড়া), তাই এগুলো মুক্তাদির পড়লে ইমামের সাথে কোনো সংঘর্ষ (Clash) হয় না।
২. কুরআনের নিষেধ:
কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকার নির্দেশ (সূরা আরাফ: ২০৪) সরাসরি 'কুরআন' শোনার ব্যাপারে এসেছে। তাসবিহ বা দোয়ার ব্যাপারে চুপ থাকার নির্দেশ নেই। তাই ফাতিহা (যেহেতু কুরআন) পড়া যাবে না, কিন্তু তাসবিহ পড়া যাবে।
৩. জেহের ও সির:
তাকবির ও তাসবিহগুলো 'সিররি' (মনে মনে) পড়া হয়। কিন্তু ফাতিহা বা কেরাত জাহরি নামাজে জোরে পড়া হয়। মুক্তাদিও যদি পড়তে শুরু করে, তবে ইমামের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে (যেমন হাদিসের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে)।

---

১২. "যখন কুরআন পড়া হয় তখন চুপ থাকো"—এই আয়াতটি কি কেবল ইমামের কেরাত শোনার ক্ষেত্রে খাস, নাকি সর্বাবস্থায় আম? (قال تعالى "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هل الأية خاص لمن سمع (قراءة الامام ام عام سمع او لم يسمع؟ بين موضحا

উত্তর:
সূরা আরাফের ২০৪ নং আয়াত "ফাসতামিউ... ওয়া আনসিতু"-এর প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে মতভেদ আছে।
১. হানাফি মাযহাব:
এই আয়াতটি 'আম' (ব্যাপক)। অর্থাৎ মুক্তাদি ইমামের কেরাত শুনতে পাক বা না পাক (দূরে থাকার কারণে বা সিররি নামাজের কারণে), সর্বাবস্থায় তাকে চুপ থাকতে হবে।

- **যুক্তি:** আয়াতে দুটি আদেশ আছে—১. ইস্তিমা (মনোযোগ দিয়ে শোনা), ২. ইনসাত (চুপ থাকা)। যদি শোনা যায় তবে শুনবে ও চুপ থাকবে। আর যদি শোনা না যায় (সিররি নামাজে), তবে কেবল 'চুপ থাকা'র হুকুম পালন করবে। তাই সিররি নামাজেও ফাতিহা পড়া যাবে না।

২. শাফেয়ি মাযহাব:
এই আয়াতটি কেবল জাহরি নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ইমামের আওয়াজ শোনা যায়। সিররি নামাজে বা না শোনা গেলে আয়াতটি প্রযোজ্য নয়, তাই সেখানে ফাতিহা পড়তে হবে।

৩. শানে নুজুল:
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি নামাজের বিষয়েই নাজিল হয়েছে। সাহাবিরা নামাজের মধ্যে কথা বলতেন বা ইমামের সাথে পড়তেন, তা বন্ধ করার জন্য এই আয়াত আসে।

---

১৩. ইমাম বুখারি (রহ.) ইমাম ও মুক্তাদি সবার জন্য কেরাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কী দলিল দিয়েছেন? (بم استدل الامام البخاري (رح) على وجوب القراءة للامام والماموم فى الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت؟)

উত্তর:
ইমাম বুখারি (রহ.) 'জুজউল কিরাআত' নামে একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছেন যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ফরজ। তাঁর প্রধান দলিলগুলো হলো:

১. হাদিসের ব্যাপকতা:
রাসুল (সা.)-এর হাদিস "লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বি-ফাতিহাতিল কিতাব" (ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই)—এটি একটি 'আম' বা সাধারণ হাদিস। এখানে ইমাম, মুক্তাদি বা একাকীর কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাই এটি সবার জন্য প্রযোজ্য।

২. আবু হুরায়রা (রা.)-এর আসার:

আবু হুরায়রা (রা.) মুক্তাদিকে বলেছিলেন "মনে মনে পড়ো"। ইমাম বুখারি বলেন, এটি প্রমাণ করে যে সাহাবিরা ইমামের পেছনে পড়তেন।

৩. কিয়াস:

ইমাম বুখারি যুক্তি দেন যে, যেমন রুকু-সিজদা ইমামের সাথে মুক্তাদিকেও করতে হয়, তেমনি কেরাতও (যা নামাজের রুকন) মুক্তাদিকে আদায় করতে হবে। ইমামের তাকবিরে যেমন মুক্তাদির তাকবির মাফ হয় না, তেমনি ইমামের কেরাতে মুক্তাদির ফাতিহা মাফ হতে পারে না।

---

১৪. শাফেয়ি মাজহাবের কেউ হানাফি ইমামের পেছনে বা হানাফি কেউ শাফেয়ি ইমামের পেছনে ইকতেদা করলে কি নামাজ সহিহ হবে? (هل يجوز اقتداء الشافعي خلف الحنفي وبالعكس مع اختلافهم في وجوب القراءة وعدمه؟)

উত্তর:

হ্যাঁ, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের পেছনে ইকতেদা করা জায়েজ এবং সহিহ। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এটি মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা)।

শর্ত:

ইকতেদা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ইমাম এমন কোনো কাজ করবেন না যা মুক্তাদির মাযহাবে নামাজ ভঙ্গের কারণ। যেমন—কোনো হানাফি ইমাম যদি ওজু ছাড়া (রক্ত বের হওয়ার পর ওজু না করে) নামাজ পড়ান, তবে শাফেয়ির নামাজ হবে (কারণ শাফেয়ি মতে রক্তে ওজু ভাঙ্গে না), কিন্তু হানাফির হবে না।

ফাতিহা প্রসঙ্গের সমাধান:

- **শাফেয়ি মুক্তাদি হানাফি ইমামের পেছনে:** শাফেয়ি মুক্তাদি ইমামের পেছনে চুপিসারে দ্রুত সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে (সতর্কতার সাথে), যাতে তার মাযহাবের ফরজ আদায় হয় এবং ইমামের বিরোধিতাও প্রকাশ্য না হয়। অথবা সে মনে করবে যে ইমামের কেরাতই তার কেরাত (মাযহাবের উদারতা)।

- **হানাফি মুক্তাদি শাফেয়ি ইমামের পেছনেঃ** হানাফি মুক্তাদি চুপ থাকবে। শাফেয়ি ইমাম যখন ফাতিহা পড়বেন, তখন সে শুনবে। আমিন জোরে বলবে (ইমামের অনুসরণে)।

সারকথাঃ মাযহাবগত মতভেদ ইজতিহাদি বিষয়, এটি ইমানের বিষয় নয়। তাই একে অপরের পেছনে নামাজ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েজ। মক্কা-মদিনায় সব মাযহাবের লোক এক ইমামের পেছনেই নামাজ পড়েন।

13- عن عائشة (رض) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج –
عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا-

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- الحديث الاول معارض للحديث الثاني فكيف التوفيق بينهما ؟
او- الحديث الأول معارض للحديث الثاني فكيف التوفيق بينهما؟
اذكر نظر الطحاوى (رح) في مسئلة القراءة خلف الامام -
2- اذا ام الامام قاعدا فكيف يصلي المأموم؟ أوضح المسئلة مع اختلاف الائمة –
3- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام؟ بين مع ذكر اختلاف الائمة فيه –
او- بين اختلاف الائمة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام مفصلا –
4- هل يجوز امامة المفتن والمبتدع؟ وما هي اقوال العلماء فيه؟
5- بين حكم امامة الاعمى والعبد والأعرابي والفاسق وولد الزنا –
6- من احق بالامامة؟ بين موضح –
7- ما هو الاختلاف في امامة الصبي؟
8- قوله "انما جعل الامام ليوتم به" هل الائتمام في الافعال فقط ام في الافعال والنيات ايضا؟ وما الاختلاف في هذه المسئلة؟
9- بين اختلاف الائمة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام مفصلا –
10-ما هو حكم قراءة الفاتحة في الركعتين الآخريين من ذوات الاربع ؟
11-لم سميت سورة الفاتحة بأم القران؟
او- كم اسما لسورة الفاتحة؟ لم سميت الفاتحة بأم الكتاب؟

12-كيف يستدل من هذا الحديث أن التسمية ليست بجزء من الفاتحة وغيرها من السور؟

13-ما معنى الخداج؟

14-كيف تصح صلوة من لم يقرأ بالفاتحة؟ وقد قال عليه السلام لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا –

15-اكتب نبذا من سيرة أبي هريرة (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن عائشة (رض) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج.

মূল হাদিস (২):

عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি (আয়েশা রা.) ইমাম আহমদ (রহ.), ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকি সংকলন করেছেন। এটি সূরা ফাতিহা পড়ার গুরুত্ব বহন করে। দ্বিতীয় হাদিসটি (আবু হুরায়রা রা.) ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৪০৪), আবু দাউদ (হাদিস নং ৬০৪), নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ সংকলন করেছেন। এটি ইমামের পেছনে চুপ থাকার দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া কি অপরিহার্য? এবং ইমাম যখন কেরাত পড়েন তখন মুক্তাদির করণীয় কী? এই দুটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধানকল্পে হাদিস দুটি এসেছে। প্রথমটি একাকী নামাজির জন্য ফাতিহার গুরুত্ব এবং দ্বিতীয়টি জামাতের ক্ষেত্রে মুক্তাদির নীরবতার বিধান বর্ণনা করে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "যে নামাজে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না, তা 'খিদাজ' বা অসম্পূর্ণ (ত্রুটিপূর্ণ)।"

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। ... সুতরাং যখন তিনি (ইমাম) কেরাত পাঠ করেন, তখন তোমরা চুপ থাকো।"

ব্যাখ্যা:

- **খিদাজ (خداج):** এর আভিধানিক অর্থ হলো উটের অপরিণত বাচ্চা প্রসব করা। পারিভাষিক অর্থ হলো অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ নামাজ। হানাফি মতে এর দ্বারা 'কামিল নামাজ নেই' বোঝানো হয়েছে, বাতিল নামাজ নয়।
- **ফআনসিতু (فانصتوا):** 'চুপ থাকো' শব্দটি হানাফি মাযহাবের সবচেয়ে বড় দলিল যে ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া যাবে না।

৪. الحاصل (সমাপনী):

একাকী নামাজ আদায়ে সূরা ফাতিহা পড়া অপরিহার্য, কিন্তু ইমামের পেছনে ইকতেদা করার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব। ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত হিসেবে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. প্রথম হাদিসটি (ফাতিহা পড়া) দ্বিতীয় হাদিসের (চুপ থাকা) সাথে সাংঘর্ষিক। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় (তাওফিক) কী? এবং এ বিষয়ে ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর 'নজর' বা যুক্তি উল্লেখ করো। (الحديث الاول معارض للحديث الثاني فكيف التوفيق بينهما؟ اذكر نظر الطحاوى (رح) في مسئلة القراءة خلف الامام))

উত্তর:

বিরোধ (Conflict):

প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে ফাতিহা ছাড়া নামাজ অসম্পূর্ণ (পড়ার নির্দেশ)। আর দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে ইমাম কেরাত পড়লে চুপ থাকতে হবে (না পড়ার নির্দেশ)।

সমন্বয় (তাওফিক):

হানাফি ফকিহগণ এর সমন্বয় এভাবে করেন:
১. প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন: প্রথম হাদিসটি (ফাতিহা পড়ার নির্দেশ) প্রযোজ্য হলো ইমাম এবং মুনফারিদ (একাকী নামাজি)-এর জন্য। তাদের জন্য ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।
২. মুক্তাদির হুকুম: দ্বিতীয় হাদিসটি (চুপ থাকা) প্রযোজ্য হলো মুক্তাদির জন্য। কারণ মুক্তাদির দায়িত্ব হলো ইমামের অনুসরণ করা এবং শোনা। আল্লাহ তাআলা কুরআনেও চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আরাফ: ২০৪)। সুতরাং, মুক্তাদি চুপ থাকলে উভয় হাদিসের ওপর এবং কুরআনের আয়াতের ওপর আমল হয়।
ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর 'নজর' বা যৌক্তিক দলিল:
ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন: আমরা যদি নামাজের অন্যান্য আমলের দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, ইমাম যা করেন মুক্তাদিও তা করেন (যেমন রুকু, সিজদা)। কিন্তু 'কিরাআত' বা পড়ার বিষয়টি ভিন্ন।

- যুক্তি হলো: যদি মুক্তাদির ওপর কেরাত পড়া ফরজ হতো, তবে ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির ওপরও সিজদা সাহু আসত না বা ইমামের কেরাত দিয়ে মুক্তাদির নামাজ হতো না। কিন্তু সর্বসম্মতভাবে **মাসবুক (দেরিতে আসা ব্যক্তি)** ইমামের সাথে রুকু পেলে তার ওই রাকাতের কেরাত মাফ হয়ে যায়।
- যদি কেরাত মুক্তাদির জন্য ফরজই হতো, তবে রুকু পাওয়ার দ্বারা তা মাফ হতো না। যেহেতু ইমামের কেরাত মাসবুকের জন্য যথেষ্ট, তাই প্রথম থেকে শরিক হওয়া মুক্তাদির জন্যও ইমামের কেরাতই যথেষ্ট। এটিই ইমাম তাহাবির 'নজর' বা সূক্ষ্ম কিয়াস।

---

২. ইমাম যদি বসে নামাজ পড়ান, তবে মুক্তাদিরা কীভাবে নামাজ পড়বে? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা করো। (اذا ام الامام قاعدا فكيف يصلي المأموم؟ أوضح المسئلة مع اختلاف الائمة)

উত্তর:
ইমাম অসুস্থতা বা ওজরের কারণে বসে নামাজ পড়ালে, সুস্থ মুক্তাদিরা কি বসে পড়বে নাকি দাঁড়িয়ে?

১. ইমাম শাফেয়ি, আবু হানিফা ও মালিক (রহ.):
তাঁদের মতে, ইমাম বসে নামাজ পড়ালেও সুস্থ ও সামর্থ্যবান মুক্তাদিদের দাঁড়িয়েই নামাজ পড়তে হবে। বসে পড়া জায়েজ নেই।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় বসে নামাজ পড়িয়েছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইকতেদায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছিলেন। এটিই ছিল রাসুল (সা.)-এর শেষ আমল, যা পূর্ববর্তী হুকুমকে রহিত (মানসুখ) করে দিয়েছে।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও আহলে হাদিস:
তাঁদের মতে, ইমাম যদি বসে নামাজ পড়েন, তবে মুক্তাদিদেরও বসে নামাজ পড়া ওয়াজিব (যদিও তারা সুস্থ হয়)।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন এবং বসে নামাজ পড়িয়েছিলেন। সাহাবিরা পেছনে দাঁড়ালে তিনি ইশারা করে বসতে বললেন এবং পরে বললেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ... وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

অর্থ: ইমামকে অনুসরণের জন্য করা হয়েছে... তিনি যখন বসে নামাজ পড়েন, তোমরাও সবাই বসে পড়ো। (সহিহ বুখারি)

হানাফি জবাব: হানাফিগণ বলেন, ইমাম আহমদ যে হাদিসটি পেশ করেন, তা ইসলামের শুরুর দিকের ঘটনা। কিন্তু রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের আগে তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া সাহাবিদের বসতে বলেননি। তাই শেষ আমল হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়াই সাব্যস্ত হয়েছে।

---

৩. ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ার হুকুম কী? মতভেদসহ আলোচনা করো। (ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام؟ بين مع ذكر اختلاف الائمة فيه)

উত্তর:
(এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী সেটেও বিস্তারিত ছিল, এখানে সংক্ষেপে)

১. হানাফি মাযহাব: ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া **মাকরুহ তাহরিমি**। মুক্তাদি চুপ থাকবে। দলিল: *"যখন কুরআন পড়া হয় তখন চুপ থাকো"* (আরাফ: ২০৪)।

২. শাফেয়ি মাযহাব: ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া **ফরজ (রুকন)**। জাহরি বা সিররি সব নামাজে পড়তে হবে। দলিল: *"ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই"*।

৩. মালিকি ও হাম্বলি: জাহরি নামাজে (শোনা গেলে) চুপ থাকবে, আর সিররি নামাজে বা না শোনা গেলে পড়বে।

---

৪. ফিতনাবাজ (মুফতিন) এবং বিদআতি ব্যক্তির ইমামতি কি জায়েজ? (هل يجوز امامة المفتن والمبتدع؟ وما هي اقوال العلماء فيه؟)

উত্তর:

বিদআতি ও ফিতনাবাজ ইমামের পেছনে নামাজের হুকুম:

১. হানাফি মাযহাব:

বিদআতি বা ফাসিক (প্রকাশ্য পাপাচারী) ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমি (অপছন্দনীয়), তবে নামাজ আদায় হয়ে যাবে (ফাসিদ হবে না)। যদি অন্য কোনো ভালো ইমাম পাওয়া যায়, তবে এদের পেছনে নামাজ না পড়াই উচিত। আর যদি অন্য ইমাম না থাকে, তবে জামাত তরক না করে এদের পেছনেই পড়া উচিত।

- **শর্ত:** যদি তাদের বিদআত **'কুফরি'** পর্যায়ের হয় (যেমন—কুরআন অস্বীকার করা, বা সাহাবিদের কাফের বলা), তবে তাদের পেছনে নামাজ পড়া একেবারেই **নাজায়েজ ও বাতিল**।

২. শাফেয়ি ও অন্য মাযহাব:

বিদআতির পেছনে নামাজ পড়া মাকরুহ, কিন্তু নামাজ সহিহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তার পেছনে নামাজ পড়ো। (দারা কুতনি)

ফতোয়া: ফিতনাবাজ বা বিদআতি ইমাম নিয়োগ করা গুনাহের কাজ। কিন্তু নিয়োগকৃত থাকলে ফেতনা এড়াতে তার পেছনে নামাজ পড়ে নেওয়া এবং পরে সুযোগ হলে পুনরায় পড়ে নেওয়া (হানাফি মতে উত্তম)।

---

৫. অন্ধ, দাস, বেদুইন, ফাসিক এবং জারজ সন্তানের ইমামতির হুকুম কী? (بين حكم امامة الاعمى والعبد والأعرابي والفاسق وولد الزنا)

উত্তর:

ইসলামে ইমামতির মাপকাঠি হলো 'ইলম' (জ্ঞান) এবং 'তাকওয়া'। তবে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গতার বিচারে ফকিহগণ কিছু শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

১. অন্ধ ব্যক্তি (আল-আ'মা): তার ইমামতি জায়েজ। তবে দৃষ্টিশক্তিমান ব্যক্তি উত্তম, কারণ অন্ধ ব্যক্তি নাপাকি থেকে নিজেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি বেশি জ্ঞানী (আ'লাম) ও ভালো কারি হন, তবে তিনিই উত্তম। (যেমন সাহাবি ইবনে উম্মে মাকতুম রা.)।

২. দাস (আল-আবদ): দাসের ইমামতি জায়েজ। তবে স্বাধীন ব্যক্তি উত্তম, কারণ দাসের হাতে সময় কম থাকে এবং সে মনিবের সেবায় ব্যস্ত থাকে।

৩. বেদুইন (আল-আরাবি): গ্রাম্য বা অশিক্ষিত বেদুইনের ইমামতি মাকরুহ। কারণ তারা সাধারণত মূর্খ হয় এবং নামাজের মাসআলা জানে না। তবে যদি জ্ঞানী হয়, তবে জায়েজ।

৪. ফাসিক (পাপাচারী): ফাসিকের ইমামতি মাকরুহ তাহরিমি। কারণ সে দ্বীনের তোয়াক্কা করে না। তবে পড়লে নামাজ হয়ে যাবে।

৫. জারজ সন্তান (ওয়ালাদুজ জিনা): তার নিজের কোনো দোষ নেই, কিন্তু পিতার পরিচয়ের অভাবে সমাজে তাকে হীন মনে করা হয়। তাই জামাতের সম্মান রক্ষার্থে তাকে ইমাম না বানানো উত্তম (মাকরুহ)। কিন্তু যদি সে বড় আলেম ও মুত্তাকি হয়, তবে তার ইমামতিতে কোনো দোষ নেই, বরং সে-ই হকদার।

---

৬. ইমামতির জন্য কে সবচেয়ে বেশি হকদার? (من احق بالامامة؟ بين موضح)

উত্তর:

জামাতে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকারের ক্রমধারা (Tertib) হাদিস ও ফিকহের আলোকে নিম্নরূপ:

হানাফি মাযহাব অনুসারে:

১. আল-আ'লামু বিস-সুন্নাহ: যিনি সুন্নাহ ও ফিকহ মাসআলা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। কারণ নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মাসআলা জানা জরুরি।

২. আল-আকরা (সর্বোত্তম কারি): যদি জ্ঞানে সমান হয়, তবে যার কিরাত বা তিলাওয়াত সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সুন্দর।

৩. আল-আউরা (অধিক মুত্তাকি): যদি কিরাতেও সমান হয়, তবে যিনি বেশি পরহেজগার।

৪. আল-আসন্নু (বয়োজ্যেষ্ঠ): যদি সব কিছুতে সমান হয়, তবে যিনি বয়সে বড় বা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী।

৫. সুন্দর চরিত্র: এরপর যার চরিত্র ও ব্যবহার ভালো।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

অর্থ: কওমের ইমামতি করবে যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালো পাঠ করে। (মুসলিম)

হানাফিগণ বলেন, সাহাবিদের যুগে 'কারি' মানেই ছিল 'আলেম'। তাই জ্ঞানই মূল মাপকাঠি।

---

৭. নাবালক শিশুর (সাবি) ইমামতি সম্পর্কে মতভেদ কী? (ما هو الاختلاف في امامة الصبي؟)

উত্তর:

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নাবালক (মুমায়্যিজ - বুঝমান কিন্তু বালেগ হয়নি) শিশুর পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে।

১. হানাফি মাযহাব:

- **ফরজ নামাজ:** নাবালকের পেছনে প্রাপ্তবয়স্কের ফরজ নামাজ পড়া **নাজায়েজ**। কারণ শিশুর নামাজ নফল, আর বড়দের নামাজ ফরজ। দুর্বল (নফল) সবল (ফরজ)-এর ইমাম হতে পারে না।
- **তারাবি ও নফল:** অধিকাংশ হানাফি মতে তারাবিতেও নাবালকের ইমামতি জায়েজ নয়। তবে কোনো কোনো ফকিহ নফলের ক্ষেত্রে শিথিলতা করেছেন।

২. শাফেয়ি মাযহাব:

নাবালকের পেছনে ফরজ ও নফল উভয় নামাজ পড়া জায়েজ।

- **দলিল:** আমর ইবনে সালামা (রা.) মাত্র ৬ বা ৭ বছর বয়সে তাঁর গোত্রের ইমামতি করেছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) তা নিষেধ করেননি। (বুখারি)

হানাফি জবাব: আমর ইবনে সালামার ঘটনাটি ছিল বিশেষ প্রেক্ষাপটে এবং তখনো ইমামতির সব শর্ত নাজিল হয়নি।

---

৮. "ইমামকে অনুসরণের জন্য বানানো হয়েছে"—এই অনুসরণ কি কেবল কাজে (আফ'আল), নাকি নিয়তেও (নিয়্যাত)? (قوله "انما جعل الامام ليوتم به" هل الائتمام في الافعال فقط ام في الافعال والنيات ايضا؟ وما الاختلاف في هذه المسئلة؟)

উত্তর:

হাদিসে বলা হয়েছে "লি-ইউ'তাম্মা বিহি" (তাকে অনুসরণ করার জন্য)। এই অনুসরণের পরিধি নিয়ে মতভেদ আছে।

১. হানাফি ও মালিকি মাযহাব:

অনুসরণ হতে হবে কাজ এবং নিয়ত (Intention) উভয় ক্ষেত্রে।

- অর্থাৎ, ইমাম ও মুক্তাদির নামাজের ধরন এক হতে হবে। ইমাম যদি জোহর পড়ে, মুক্তাদিকেও জোহরের নিয়ত করতে হবে।
- **ফলাফল:** ফরজ পড়নেওয়ালা নফল পড়নেওয়ালার পেছনে ইকতেদা করতে পারবে না। জোহর পড়নেওয়ালা আসর

পড়নেওয়ালার পেছনে পারবে না। কারণ, ইমামের নিয়ত দুর্বল হলে মুক্তাদির শক্তিশালী নিয়ত কাজ করবে না।

২. শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব:

অনুসরণ কেবল বাহ্যিক কাজ বা রুকনগুলোর ক্ষেত্রে আবশ্যক। নিয়তের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও চলবে।

- **ফলাফল:** তাদের মতে, ফরজ পড়নেওয়ালা নফল পড়নেওয়ালার পেছনে (যেমন মুয়াজ রা. এর ঘটনা) নামাজ পড়তে পারবে। এমনকি জোহর পড়নেওয়ালা আসর পড়নেওয়ালার পেছনেও পড়তে পারবে।
- **দলিল:** মুয়াজ (রা.) নবীজির সাথে এশা পড়তেন (তাঁর জন্য ফরজ), পরে গিয়ে এলাকায় ইমামতি করতেন (তাঁর জন্য নফল, কওমের জন্য ফরজ)।

---

৯. ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে বিস্তারিত মতভেদ লেখ। (بين اختلاف الائمة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام مفصلا)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি ৩ নং প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি। বিস্তারিত উত্তরের জন্য ৩ নং ও পূর্ববর্তী সেটের উত্তর দেখুন। সংক্ষেপে: শাফেয়ি = ফরজ; হানাফি = মাকরুহ; মালিকি = সিররি নামাজে পড়া যাবে, জাহরিতে চুপ থাকবে)

---

১০. চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে ফাতিহা পড়ার হুকুম কী? (ما هو حكم قراءة الفاتحة في الركعتين الآخريين من ذوات الاربع ؟)

উত্তর:

১. হানাফি মাযহাব:

ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে (৩য় ও ৪র্থ) সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। ওয়াজিব বা ফরজ নয়।

- মুসল্লির ইখতিয়ার আছে: সে চাইলে ফাতিহা পড়তে পারে, চাইলে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ ৩ বার) পড়তে পারে, অথবা চুপ করে

দাঁড়িয়ে থাকতে পারে (সাকিৎ)। তবে ফাতিহা পড়া উত্তম। যদি না পড়ে বা অন্য সূরা মিলায়, তবুও সিজদা সাহু লাগবে না।

২. শাফেয়ি ও অন্য মাযহাব:
শেষ দুই রাকাতেও সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ (রুকন)। না পড়লে নামাজ বাতিল হবে।

---

১১. সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' কেন বলা হয়? (لم سميت سورة الفاتحة بأم القران؟)

উত্তর:

নামকরণ: 'উম্ম' (أم) শব্দের অর্থ মা, মূল, বা উৎস। সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বা 'উম্মুল কিতাব' বলার কারণগুলো হলো:
১. সারসংক্ষেপ: পুরো কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত তিনটি: তাওহিদ (আল্লাহর পরিচয়), আহকাম (বিধি-বিধান) এবং কাসাস (গল্প বা পরকাল)। সূরা ফাতিহায় এই তিনটি বিষয়ই সংক্ষেপে রয়েছে।
* আলহামদু... মালিকি ইয়াউমিদ্দিন: তাওহিদ ও পরকাল।
* ইয়্যাকা নাবুদু...: ইবাদত ও আহকাম।
* সিরাতাল্লাজিনা...: নবী ও পথভ্রষ্টদের উপমা (কাসাস)।

২. সূচনা: কুরআন লেখা এবং পড়া—উভয়টি এই সূরা দিয়ে শুরু হয়। যেমন মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হয় কারণ সেখান থেকে পৃথিবীর সূচনা।
৩. শ্রেষ্ঠত্ব: এটি কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা এবং নামাজের মূল ভিত্তি।

---

১২. এই হাদিস থেকে কীভাবে প্রমাণ হয় যে 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়? (كيف يستدل من هذا الحديث أن التسمية ليست بجزء من الفاتحة وغيرها من السور؟)

উত্তর:

হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেছেন: "كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن" (যে নামাজে উম্মুল কুরআন পড়া হয় না...)।
অন্য বর্ণনায় এসেছে: রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজ শুরু করতেন "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন" দিয়ে।

হানাফি ইস্তিদলাল (প্রমাণ গ্রহণ):
যদি 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ হতো, তবে হাদিসে বলা হতো "তিনি বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন"। কিন্তু সাহাবিরা বলছেন তিনি "আলহামদু" দিয়ে শুরু করতেন। এটি প্রমাণ করে বিসমিল্লাহ একটি স্বতন্ত্র আয়াত যা বরকতের জন্য পড়া হয়, কিন্তু এটি ফাতিহার অংশ নয়। এ কারণেই হানাফি ও মালিকি মাযহাবে নামাজে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া হয় না।

---

১৩. 'খিদাজ' (الخداج) শব্দের অর্থ কী? (ما معنى الخداج؟)

উত্তর:
ক. আভিধানিক অর্থ:
'খিদাজ' শব্দটি 'খাদাজা' (خدج) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ:
১. অপূর্ণাঙ্গ প্রসব: উটনি যখন সময়ের আগে বা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে বাচ্চা প্রসব করে, তখন তাকে 'খিদাজ' বলা হয়।
২. অপূর্ণতা (নুকসান): কোনো কিছুতে ত্রুটি থাকা।
খ. হাদিসে ব্যবহৃত অর্থ:
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে "ফাসিয়া খিদাজ"-এর অর্থ হলো—সেই নামাজ অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ (গাইরু তামাম)। অর্থাৎ নামাজটি আদায় হয়েছে, কিন্তু তার সওয়াব বা গুণগত মান পূর্ণ হয়নি। হানাফিগণ এই অর্থই গ্রহণ করেন। শাফেয়িগণ এর অর্থ করেন 'বাতিল'।

---

১৪. ফাতিহা না পড়লে নামাজ কীভাবে সহিহ হবে, অথচ নবীজি বলেছেন "ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই"? (كيف تصح صلوة من لم يقرأ بالفاتحة؟ وقد قال عليه السلام لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا)

উত্তর:
হানাফি ব্যাখ্যা:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী "লা সালাতা..." (নামাজ নেই)—এটি আরবি ব্যাকরণের 'নাফি' (Negation)। উসুল আল-ফিকহ অনুযায়ী এর দুটি অর্থ হতে পারে:

১. নাফি আল-জাত/সিহহাত: সত্তা বা বৈধতা নাকচ করা (নামাজ বাতিল)।

২. নাফি আল-কামাল: পূর্ণাঙ্গতা নাকচ করা (নামাজ অসম্পূর্ণ)।

হানাফি ফকিহগণ বলেন, এখানে 'নাফি আল-কামাল' উদ্দেশ্য। যেমন হাদিসে আছে: "মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদ ছাড়া হয় না।" এর মানে এই নয় যে ঘরে পড়লে নামাজ বাতিল হবে, বরং মসজিদের জামাতের সওয়াব পাওয়া যাবে না।

তেমনি, ফাতিহা না পড়লে (ইমামের পেছনে বা ভুলে) নামাজ বাতিল হবে না, বরং অসম্পূর্ণ হবে। কারণ কুরআনের নির্দেশ "ফাকরাউ মা তায়াসসারা" (কুরআন থেকে যা সহজ পড়ো) একটি অকাট্য দলিল। ফাতিহাকে ফরজ করলে এই আয়াত অকেজো হয়ে যায়। তাই ফাতিহা পড়া 'ওয়াজিব' (জরুরি), কিন্তু 'ফরজ' (বাধ্যতামূলক রুকন) নয়। ওয়াজিব তরক হলে নামাজ মাকরুহ হয় বা সিজদা সাহু লাগে, কিন্তু বাতিল হয় না।

---

১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذا من سيرة أبي هريرة (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর আসল নাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো আবদুর রহমান ইবনে সাখর আদ্-দাউসি। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল আবদুশ শামস। তিনি ইয়েমেনের দাওস গোত্রের লোক।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন।

আবু হুরায়রা উপাধি:
ছোটবেলায় তিনি বিড়াল ছানা নিয়ে খেলতেন এবং জামার আস্তিনে বিড়াল রাখতেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আদর করে 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল ছানার পিতা) বলে ডাকতেন। এই নামেই তিনি জগতবিখ্যাত হন।
জ্ঞান ও হাদিস বর্ণনা:
তিনি 'আসহাবে সুফফা'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার আঁকড়ে পড়ে থাকতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি যা শুনতেন, তা আর ভুলতেন না। তিনি সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী (মুকাসসিরিন)। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি।
ইন্তেকাল:
তিনি ৫৭ হিজরি মতান্তরে ৫৯ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

14- عن عائشة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الوتر لغة وشرعا ؟ هل الوتر واجب ام سنة؟ اذكر اختلاف الائمة بالتفصيل -

2- اكتب عدد ركعات صلوة الوتر بالادلة النقلية –

3- المشهور ان خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله فان قيل أن الوتر واجب صارت ست صلوات في اليوم والليلة فما هو التوفيق؟

4- اداء صلوة الوتر في اول الليل الفضل ام في اخره؟

5- بين وقت صلوة الوتر موضحا –

6- تحدث عن فضائل قيام الليل مختصرا -

7- اكتب نبذة من حياة عائشة (رض) -

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عائشة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি তাহাজ্জুদ ও বিতর নামাজের সংখ্যা ও পদ্ধতি এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রাতের আমল সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ৬২৬, ৯৯৪), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ৭৩৬) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' (বুখারি ও মুসলিম উভয়ের ঐকমত্যপূর্ণ) হওয়ায় এর বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রাতের ইবাদতের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সাহাবিরা নবীজি (সা.)-এর রাতের নামাজের রাকাত সংখ্যা, বিতর পড়ার পদ্ধতি এবং ফজরের পূর্বের আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এই বিবরণ দেন। বিশেষ করে বিতর নামাজ যে রাতের শেষ নামাজ এবং ফজরের সুন্নাত যে সংক্ষিপ্ত হয়, তা বোঝানোই এর প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে **১১** রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এর মধ্যে এক রাকাত দ্বারা তিনি বিতর করতেন (অর্থাৎ জোড় সংখ্যার সাথে এক মিলিয়ে মোট সংখ্যাকে বিজোড় করতেন)। যখন তিনি নামাজ শেষ করতেন, তখন ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। অবশেষে যখন মুয়াজ্জিন তাঁর কাছে আসতেন (ফজরের আযানের পর), তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নাত) নামাজ আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা:

- **১১ রাকাত:** এর মধ্যে ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ এবং ৩ রাকাত বিতর অন্তর্ভুক্ত (হানাফি ব্যাখ্যা মতে)।
- **এক রাকাত দ্বারা বিতর:** এর অর্থ এই নয় যে তিনি শুধু **১** রাকাত বিতর পড়তেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি দুই রাকাত করে নামাজ পড়ে শেষে **১** রাকাত মিলিয়ে মোট ৩ রাকাতকে বিজোড় বানাতেন। অথবা হানাফি মতে, তিনি ৩ রাকাত একসাথে পড়তেন, শেষের **১** রাকাতের কারণে পুরো নামাজটি বিজোড় (বিতর) হতো।
- **ডান কাতে শোয়া:** তাহাজ্জুদ ও বিতর শেষ করে ফজরের সুন্নাতের আগে বা পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া সুন্নাত।

৪. الحاصل (সমাপনী):

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও বিতর পড়তেন। বিতর হলো রাতের শেষ নামাজ। আর ফজরের সুন্নাত কেরাত লম্বা না করে সংক্ষেপে পড়া উত্তম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'বিতর' (الوتر) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বিতর ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? ইমামদের মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করো। (ما معنى الوتر لغة وشرعا ؟ هل الوتر واجب ام سنة؟ اذكر اختلاف الائمة بالتفصيل)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'বিতর' (الوتر) শব্দের অর্থ হলো—বিজোড়, একক, যা জোড় নয়। (যেমন ১, ৩, ৫)।
- **পারিভাষিক অর্থ:** এশার নামাজের পর এবং সুবহে সাদিকের আগে নির্দিষ্ট নিয়মে যে তিন রাকাত (বা বিজোড় সংখ্যক) নামাজ পড়া হয়, তাকে সালাতুল বিতর বলা হয়।

খ. বিতর ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? (মতভেদ):

এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতে, বিতর নামাজ ওয়াজিব (অপরিহার্য)। এটি নফল বা সাধারণ সুন্নাত নয়। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তবে গুনাহগার হবে এবং কাজা করা ওয়াজিব হবে।

- **দলিল ১:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: বিতর সত্য (অবশ্যকরণীয়)। যে বিতর পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

এখানে "লাইসা মিন্না" (আমাদের দলভুক্ত নয়) শব্দটি সাধারণত ওয়াজিব তরক করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

- **দলিল ২:** আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার"। অনেক মুফাসসিরের মতে এখানে 'সাল্লি' দ্বারা ঈদের নামাজ এবং বিতর নামাজ বোঝানো হয়েছে।
- **দলিল ৩:** রাসুল (সা.) সফরে নফল নামাজ সওয়ারির ওপর পড়তেন, কিন্তু ফরজ ও বিতর নামাজ সওয়ারি থেকে নেমে মাটিতে পড়তেন। এটি বিতরের গুরুত্ব ফরজের কাছাকাছি প্রমাণ করে।

২. জুমহুর উলামা (ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ):
তাঁদের মতে, বিতর নামাজ সুন্নাত মুয়াক্কাদা। এটি ওয়াজিব নয়।

- **দলিল ১:** এক বেদুইন রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আল্লাহ আমার ওপর দিনে ও রাতে কত ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন?" তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত, যদি না তুমি নফল হিসেবে কিছু করো।" (বুখারি)। এই হাদিস প্রমাণ করে ৫ ওয়াক্তের বাইরে কোনো ফরজ বা ওয়াজিব নামাজ নেই।
- **দলিল ২:** রাসুল (সা.) বলেছেন, *"তিনটি বস্তু আমার জন্য ফরজ, আর তোমাদের জন্য নফল (সুন্নাত)—১. বিতর, ২. দন্ত মার্জন (মেসওয়াক), ৩. তাহাজ্জুদ।"*

হানাফিদের জবাব: বেদুইনের হাদিসে 'ফরজ'-এর কথা বলা হয়েছে। হানাফি মতে বিতর 'ফরজ' নয়, বরং 'ওয়াজিব'। ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিতর আমলগতভাবে ফরজের মতো জরুরি, কিন্তু বিশ্বাসগতভাবে ফরজের নিচে।

---

২. বিতর নামাজের রাকাত সংখ্যা কত? নাকলি (হাদিসভিত্তিক) দলিলসহ লেখ। (اكتب عدد ركعات صلوة الوتر بالادلة النقلية)

উত্তর:
বিতর নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।
১. হানাফি মাযহাব (৩ রাকাত):
হানাফি মাযহাব মতে, বিতর নামাজ মাগরিবের নামাজের মতোই এক সালামে ৩ রাকাত। অর্থাৎ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরানো যাবে না, বরং বসতে হবে (তাশাহহুদ পড়তে হবে), এরপর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাত পড়ে, রুকুর আগে দুআ কুনুত পড়ে তারপর রুকু-সিজদা করে সালাম ফিরাতে হবে। ১ রাকাত বিতর হানাফি মতে জায়েজ নেই।

- **দলিল ১ (আয়েশা রা.):**

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) তিন রাকাত বিতর পড়তেন এবং শেষের রাকাত ছাড়া (মাঝখানে) সালাম ফিরাতেন না। (মুস্তাদরাকে হাকিম ও নাসায়ি)

- **দলিল ২ (ইবনে আব্বাস রা.):** রাসুল (সা.) বিতর পড়তেন ৩ রাকাত, যেমন মাগরিবের নামাজ। (তবে মাগরিবের সাথে পার্থক্য হলো বিতরে কুনুত আছে)।
- **যুক্তি:** ১ রাকাত নামাজ বা 'বুতাইরা' (লেজ কাটা নামাজ) পড়তে সাহাবিরা নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *"এক রাকাত নামাজের কোনো অস্তিত্ব নেই।"*

২. শাফেয়ি ও জুমহুর মাযহাব (১, ৩, ৫...):

তাঁদের মতে, বিতর ১ রাকাতও পড়া যায়, আবার ৩, ৫ বা ৭ রাকাতও পড়া যায়। ৩ রাকাত পড়লে দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে শেষ ১ রাকাত আলাদা পড়া উত্তম।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

অর্থ: বিতর হলো শেষ রাতের এক রাকাত নামাজ। (সহিহ মুসলিম)

- আলোচ্য হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেছেন: *"ইউতিরু মিনহা বি-ওয়াহিদাতিন"* (এক রাকাত দ্বারা তিনি বিতর করতেন)। শাফেয়িরা এর শাব্দিক অর্থ নেন যে তিনি ১ রাকাত পড়তেন। হানাফিরা অর্থ নেন যে তিনি শেষের ১ রাকাত মিলিয়ে মোট সংখ্যাকে বিজোড় করতেন।

---

৩. প্রসিদ্ধ আছে যে দিনে-রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। এখন যদি বিতরকে ওয়াজিব বলা হয় তবে তো ৬ ওয়াক্ত হয়ে যায়। এর সমাধান কী? (المشهور ان خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله فان قيل (أن الوتر واجب صارت ست صلوات في اليوم والليلة فما هو التوفيق؟)

উত্তর:

আপাত সমস্যা (ইশকাল):

হাদিসে জিবরাইল এবং বেদুইনের হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে নামাজ ৫ ওয়াক্ত (ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা)। হানাফি মাযহাবে বিতরকে 'ওয়াজিব' বলা হয়। উসুল অনুযায়ী ওয়াজিব ও ফরজের বিধান আমল করার

ক্ষেত্রে প্রায় সমান। তাহলে কি হানাফি মতে নামাজ ৬ ওয়াক্ত? এটি তো হাদিস বিরোধী!

সমাধান ও সমন্বয় (তাওফিক):

হানাফি ফকিহগণ এর অত্যন্ত যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক সমাধান দিয়েছেন:

১. ফরজ ও ওয়াজিবের পার্থক্য:

হানাফি উসুল অনুযায়ী 'ফরজ' এবং 'ওয়াজিব' এক জিনিস নয়।

- **ফরজ:** যা অকাট্য দলিল (কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদিস) দ্বারা প্রমাণিত। অস্বীকার করলে কাফের হয়। ৫ ওয়াক্ত নামাজ হলো 'ফরজ'।
- ওয়াজিব: যা যন্নি দলিল (খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াস) দ্বারা প্রমাণিত। অস্বীকার করলে কাফের হয় না, তবে ত্যাগ করলে কবিরা গুনাহ হয়। বিতর হলো 'ওয়াজিব'।

সুতরাং, ৫ ওয়াক্ত নামাজ হলো 'ফরজ' আর বিতর হলো 'ওয়াজিব'। হাদিসে ৫ ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে 'ফরজ' হিসেবে। ওয়াজিবের কথা সেখানে অস্বীকার করা হয়নি।

২. 'সালাত' শব্দের প্রয়োগ:

হাদিসে যখন ৫ ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে, তখন মূল 'ফরজ' নামাজের কথা বলা হয়েছে। বিতর এশার নামাজের সময়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি এশার অনুগামী (তাবে')। তাই আলাদাভাবে এর নাম উল্লেখ না করলেও ৫ ওয়াক্তের কাঠামোর বাইরে এটি নতুন কোনো 'ফরজ' ওয়াক্ত সৃষ্টি করে না।

৩. উদাহরণ:

যেমন ঈদের নামাজ ওয়াজিব। ঈদের নামাজ পড়লে কি আমরা বলি যে নামাজ ৬ ওয়াক্ত হয়ে গেছে? না। তেমনি বিতর ওয়াজিব হলেও তা ৫ ওয়াক্ত ফরজের সংখ্যাকে প্রভাবিত করে না। এটি একটি অতিরিক্ত জরুরি ইবাদত।

---

৪. বিতর নামাজ কি রাতের শুরুতে পড়া উত্তম নাকি শেষে পড়া উত্তম? (اداء صلوة الوتر في اول الليل الفضل ام في اخره؟)

উত্তর:

বিতর নামাজ আদায়ের উত্তম সময় ব্যক্তির অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

১. রাতের শেষে (আখেরুল লাইল) - আফজাল:

যে ব্যক্তি নিশ্চিত যে সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগতে পারবে, তার জন্য তাহাজ্জুদ পড়ার পর সুবহে সাদিকের ঠিক আগে বিতর পড়া সর্বোত্তম (আফজাল)।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

অর্থ: তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামাজ বানাও বিতরকে। (সহিহ বুখারি)

- আরও বলেছেন: *"যে শেষ রাতে জাগার আশা রাখে, সে যেন শেষ রাতে বিতর পড়ে। কারণ শেষ রাতের নামাজে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে এবং তা ফজিলতপূর্ণ।"* (মুসলিম)

২. রাতের শুরুতে (আউয়ালুল লাইল) - সতর্কতা:

যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে সে শেষ রাতে জাগতে পারবে না, তার জন্য ঘুমানোর আগেই (এশার নামাজের পর) বিতর পড়ে নেওয়া উত্তম ও সতর্কতামূলক।

- **দলিল:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: *"আমার খলিল (বন্ধু) রাসুল (সা.) আমাকে তিনটি ওসিয়ত করেছেন... তার মধ্যে একটি হলো ঘুমানোর আগে বিতর পড়া।"* (বুখারি)। কারণ আবু হুরায়রা (রা.) রাতে হাদিস মুখস্থ করতেন, তাই শেষ রাতে ওঠা তাঁর জন্য কঠিন ছিল।

সারকথা: জাগার আত্মবিশ্বাস থাকলে শেষে পড়া উত্তম, না থাকলে শুরুতে পড়া উত্তম।

---

৫. বিতর নামাজের সময়সীমা বিস্তারিত বর্ণনা করো। (بين وقت صلوة الوتر موضحا)

উত্তর:

বিতর নামাজের সময়সীমা নিয়ে ফকিহদের মতামত নিম্নরূপ:

শুরুর সময়:

সকল মাযহাবের ঐকমত্যে, বিতর নামাজের সময় শুরু হয় এশার ফরজ নামাজের পর থেকে।

- যদি কেউ এশার ওয়াক্তে কিন্তু এশার ফরজের আগে বিতর পড়ে, তবে তা আদায় হবে না (হানাফি মতে)। অবশ্যই এশার ফরজ পড়ার পর বিতর পড়তে হবে।
- এশার ওয়াক্ত থাকলেই কেবল বিতর পড়া যাবে তা নয়, বরং এশার ফরজ পড়াটা শর্ত।

শেষ সময়:

বিতর নামাজের শেষ সময় হলো সুবহে সাদিক (ফজরের ওয়াক্ত) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

- সুবহে সাদিক হয়ে গেলে বিতরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় (হানাফি ও শাফেয়ি মতে)।

কাজা প্রসঙ্গ:

- **হানাফি মাযহাব:** যেহেতু বিতর ওয়াজিব, তাই ওয়াক্ত চলে গেলে (ফজর হয়ে গেলে) এর **কাজা আদায় করা ওয়াজিব**। কাজা না করে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এমনকি দিনের বেলাতেও কাজা করা যাবে (তবে জামাতের সাথে নয়)।
- **শাফেয়ি মাযহাব:** বিতর সুন্নাত, তাই ওয়াক্ত চলে গেলে কাজা করা জরুরি নয়, তবে নফল হিসেবে পড়া যায়।

---

৬. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের ফজিলত সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (تحدث عن فضائل قيام الليل مختصرا)

উত্তর:

কিয়ামুল লাইল (রাতের নামাজ) বা তাহাজ্জুদ মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। এর ফজিলত অপরিসীম:

১. মাকামে মাহমুদ:

আল্লাহ তাআলা নবীজি (সা.)-কে বলেছেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

অর্থ: রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন... আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছাবেন। (সূরা বনি ইসরাইল: ৭৯)

২. শ্রেষ্ঠ নফল নামাজ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

অর্থ: ফরজ নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজ। (সহিহ মুসলিম)

৩. দোয়া কবুল:

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং ডাকতে থাকেন: "কে আছ আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"

৪. মুমিনের সম্মান:

জিবরাইল (আ.) এসে বলেছেন: "হে মুহাম্মদ! জেনে রাখুন, মুমিনের সম্মান (শারাফ) হলো তার রাতের নামাজে।"

---

৭. উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب نبذة من حياة عائشة (رض))

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: ১০ম সেটের ১৪নং প্রশ্নে বিস্তারিত জীবনী দেওয়া হয়েছে। এখানে ভিন্ন আঙ্গিকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো)

জন্ম ও বংশ:

তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং মাতা উম্মে রুমান বিনতে আমির। তিনি নবুয়তের ৪র্থ বা ৫ম বছরে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবাহ ও বৈশিষ্ট্য:

হিজরতের পূর্বে মক্কায় মাত্র ৬ বছর বয়সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং ৯ বছর বয়সে মদিনায় তিনি স্বামীর ঘরে আসেন। তিনি

ছিলেন রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র কুমারী। তাঁর বিছানায় থাকা অবস্থায় রাসুল (সা.)-এর ওপর ওহি নাজিল হতো। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাজিল করেছেন।

জ্ঞান ও হাদিস প্রচার:

তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর মা এবং মহান শিক্ষিকা। ইলমে দ্বীনের প্রচারে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে নারীদের মাসআলা এবং রাসুল (সা.)-এর ঘরোয়া জীবনের সুন্নাহগুলো তাঁর মাধ্যমেই উম্মত জানতে পেরেছে।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরির ১৭ই রমজান মদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জানাজায় ইমামতি করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

15- عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله (رض) اخبره آن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بدفن قتلى احد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا -

وعن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما الاختلاف بين الائمة في الصلوة على الشهداء؟ وما ادلتهم؟ بين –

2- عرف الشهيد ثم بين فضله موجزا –

3- كم قسما للشهيد؟ وما هو حكم غسل الشهيد؟ اذكر اختلاف العلماء فيه مدللا-

4- اين احد؟ وما وجه تسمية هذه الغزوة باحد؟

5- بين نتائج غزوة احد –

6- كم كان عدد المسلمين في غزوة احد؟ وكم قتلوا فيها ؟

7- متى وقعت غزوة احد؟

8- كم رجلا كان في الرماة؟ ومن كان اميرهم؟

9- ما معنى الجنائز لغة وشرعا ؟

10-ما هي اقوال العلماء في الصلوة على الشهداء؟

11-متى شرعت صلوة الجنازة ؟

12-هل تجوز صلوة الجنازة على الغائب؟ وما الاختلاف فيه؟ فصل بالادلة –

13-ما هو حكم القيام للجنازة؟ وما الاختلاف فيه؟ بين–

14-ما الاختلاف في صلوة الجنازة في المسجد؟ بين بالادلة –

15-بين نبذة من حياة جابر بن عبد الله (رض) -

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله (رض) اخبره آن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بدفن قتلى احد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.

মূল হাদিস (২):

وعن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি (জাবের রা.) ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ১৩৪৩) ও আবু দাউদ (হাদিস নং ৩১৩৪) সংকলন করেছেন। এটি শহীদের জানাজা ও গোসল না দেওয়ার দলিল।

দ্বিতীয় হাদিসটি (উকবা রা.) ইমাম বুখারি (হাদিস নং ১৩৪৪) ও মুসলিম (হাদিস নং ২২৯৬) সংকলন করেছেন। এটি জানাজা পড়ার বা দোয়া করার দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শহীদ হন। তাঁদের দাফন-কাফন কীভাবে হবে, তাঁদের গোসল দেওয়া হবে কি না এবং জানাজা পড়া হবে কি না—এ নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা এই হাদিসগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম হাদিসটি যুদ্ধের ঠিক পরের ঘটনা, আর দ্বিতীয় হাদিসটি রাসুল (সা.)-এর ওফাতের কিছুকাল আগের ঘটনা।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে তাঁদের রক্তমাখা অবস্থাতেই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের জানাজার নামাজ পড়েননি এবং তাঁদের গোসলও দেননি।

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন (উহুদ যুদ্ধের ৮ বছর পর) বের হলেন

এবং উহুদবাসীদের (শহীদের) ওপর নামাজ পড়লেন, যেভাবে তিনি মৃতের ওপর নামাজ পড়েন (জানাজার নামাজ)।

ব্যাখ্যা:

- **গোসল না দেওয়া:** শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন মেশকের সুঘ্রাণ ছড়াবে, তাই তাঁদের রক্ত ধুয়ে ফেলা হয় না। এটি সকল ইমামের ঐকমত্য।
- **জানাজা না পড়া (বিরোধ):** প্রথম হাদিস বলে জানাজা পড়েননি। দ্বিতীয় হাদিস বলে পড়েছেন।
    - *শাফেয়ি মত:* জানাজা পড়েননি। দ্বিতীয় হাদিসের 'সালাত' মানে দোয়া করা।
    - *হানাফি মত:* জানাজা পড়া ওয়াজিব। প্রথম হাদিসে না পড়ার কারণ ছিল ব্যস্ততা বা দুর্বলতা। দ্বিতীয় হাদিস প্রমাণ করে তিনি পরে পড়েছিলেন অথবা অন্য হাদিসে আছে তিনি হামজা (রা.)-এর ওপর ৭০ বার নামাজ পড়েছেন।

৪. الحاصل (সমাপনী):

শহীদদের গোসল দেওয়া হবে না এবং রক্তসহ দাফন করা হবে। তবে জানাজা পড়া নিয়ে মতভেদ থাকলেও হানাফি মতে জানাজা পড়া ওয়াজিব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. শহীদদের ওপর জানাজার নামাজ পড়া নিয়ে ইমামগণের মতভেদ ও দলিল বিস্তারিত লেখ। (ما الاختلاف بين الائمة في الصلوة على الشهداء؟ وما ادلتهم؟ بين)

উত্তর:

উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জানাজা পড়া হয়েছিল কি না, এ নিয়ে হাদিসের ভিন্নতার কারণে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মত:

তাঁদের মতে, যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদের ওপর জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নয় (পড়া হবে না)।

- **দলিল:** হযরত জাবের (রা.)-এর হাদিস (আলোচ্য হাদিস-১): *"রাসুল (সা.) তাঁদের ওপর নামাজ পড়েননি এবং গোসলও দেননি।"*
- **যুক্তি:** শহীদরা জীবিত (বাল আহয়াউম ইনদা রাব্বিহিম)। জানাজা পড়া হয় মৃতদের শাফায়াতের জন্য। শহীদরা তো নিজেরাই শাফায়াতকারী, তাঁদের শাফায়াতের প্রয়োজন নেই। উকবা (রা.)-এর হাদিসের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন, সেখানে 'সালাত' মানে দোয়া করা (বিদায়ী দোয়া), শরয়ী জানাজা নয়।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতে, শহীদদের ওপর জানাজার নামাজ পড়া ওয়াজিব।

- **দলিল ১:** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: *"রাসুলুল্লাহ (সা.) হামজা (রা.)-এর জানাজা আদায় করেছেন এবং সাতটি তাকবির বলেছেন।"* (তাবারানি)
- **দলিল ২:** উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদিস (আলোচ্য হাদিস-২): *"তিনি উহুদের শহীদদের ওপর মৃতের নামাজের মতোই নামাজ পড়েছেন।"* এখানে 'কাল-মায়্যিত' (মৃতের মতো) শব্দ প্রমাণ করে এটি দোয়া নয়, বরং জানাজার নামাজ ছিল।
- **দলিল ৩:** রাসুল (সা.)-এর সাধারণ নির্দেশ *"সৎ ও অসৎ সবার জানাজা পড়ো"*। শহীদ এর বাইরে নন।
- **জাবের (রা.)-এর হাদিসের জবাব:** হানাফিগণ বলেন, জাবের (রা.) হয়তো দেখেননি অথবা যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, সাহাবিদের জখম এবং ক্লান্তির কারণে তখন পড়া সম্ভব হয়নি। পরে রাসুল (সা.) আলাদাভাবে বা একত্রে পড়ে দিয়েছেন। জানাজা না পড়াটা ছিল ওজরের কারণে, বিধান হিসেবে নয়।

---

২. শহীদের সংজ্ঞা দাও এবং সংক্ষেপে তাঁর ফজিলত বর্ণনা করো। (عرف الشهيد ثم بين فضله موجزا)

উত্তর:

ক. শহীদের পরিচয়:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'শহীদ' (الشهيد) শব্দটি 'শাহাদাহ' থেকে এসেছে। অর্থ—সাক্ষ্যদাতা, উপস্থিত ব্যক্তি।
- **পারিভাষিক অর্থ:** যে মুসলমান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয় অথবা এমন অবস্থায় মারা যায় যা শরিয়তে শাহাদাত হিসেবে গণ্য, তাকে শহীদ বলা হয়।
- **হানাফি সংজ্ঞা:** যে মুসলমান ধরাপৃষ্ঠে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায় এবং যার হত্যার বিনিময়ে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) ওয়াজিব হয় না, বরং কিসাস ওয়াজিব হয়।

খ. শহীদের ফজিলত:

কুরআন ও হাদিসে শহীদের অসামান্য মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে:

১. জীবিত থাকা: আল্লাহ বলেন:

> وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

> অর্থ: যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত ও রবের পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত। (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

২. পাপ মোচন: শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ (ঋণ ছাড়া) মাফ করে দেন।

৩. শাফায়াত: শহীদ কিয়ামতের দিন তার পরিবারের ৭০ জন সদস্যের জন্য শাফায়াত করতে পারবে।

৪. জান্নাতে বিচরণ: শহীদের রুহ সবুজ পাখির পেটে করে জান্নাতের ফলমূল খেয়ে বেড়ায়।

৫. মৃত্যুকষ্টহীনতা: শহীদ মৃত্যুর সময় পিপঁপড়ার কামড়ের চেয়ে বেশি ব্যথা অনুভব করে না।

---

৩. শহীদ কত প্রকার? শহীদের গোসলের হুকুম কী? আলেমদের মতভেদসহ লেখ। (كم قسما للشهيد؟ وما هو حكم غسل الشهيد؟ اذكر اختلاف العلماء فيه مدللا)

উত্তর:

শহীদের প্রকারভেদ:

ফকিহগণ শহীদকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করেছেন:

১. শহীদে দুনিয়া ও আখেরাত (কামিল শহীদ): যে মুসলমান কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয় এবং দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ থাকে না। তার গোসল ও কাফন হবে না, জানাজা হবে।
২. শহীদে আখেরাত (হুকমি শহীদ): যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে নয় বরং বিশেষ কোনো রোগে বা দুর্ঘটনায় মারা যায়। যেমন—পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, প্লেগে বা পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি। তারা পরকালে শহীদের সওয়াব পাবে, কিন্তু দুনিয়ায় তাদের গোসল ও কাফন সাধারণ মৃতের মতোই হবে।
৩. শহীদে দুনিয়া: যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে মারা যায় কিন্তু তার নিয়ত ছিল গনীমতের মাল বা খ্যাতি। সে দুনিয়ায় শহীদের বিধান (বিনা গোসলে দাফন) পাবে, কিন্তু আখেরাতে সওয়াব পাবে না।
গোসলের হুকুম ও মতভেদ:
যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদের গোসল সম্পর্কে মতভেদ:
১. হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব (গোসল নেই):
তাঁদের মতে, কামিল শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না। তাকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্তসহ দাফন করা হবে।

- **দলিল:** আলোচ্য জাবের (রা.)-এর হাদিস: *"রাসুল (সা.) তাদের গোসল দেননি।"* রাসুল (সা.) বলেছেন, *"তাদের রক্ত কেয়ামতের দিন মেশকের ঘ্রাণ ছড়াবে।"*
- **ব্যতিক্রম:** যদি শহীদ 'নাপাক' (গোসল ফরজ) অবস্থায় মারা যায় (যেমন হানজালা রা.), তবে **হানাফি মতে** তাকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। **শাফেয়ি মতে** তবুও গোসল দেওয়া যাবে না।

২. ইমাম মালিক (রহ.) ও সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব:
তাঁদের মতে, শহীদকেও গোসল দিতে হবে। কারণ গোসল মৃতের হক। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীতে এই মতটি দুর্বল।

---

৪. উহুদ কোথায় অবস্থিত? এই যুদ্ধকে 'উহুদ' নামে কেন নামকরণ করা হয়? (اين احد؟ وما وجه تسمية هذه الغزوة باحد؟)
উত্তর:
অবস্থান (মাকান):

উহুদ (أُحُد) মদিনা মুনাওয়ারা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক পাহাড়। মসজিদে নববি থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার। এই পাহাড়টি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ।

নামকরণের কারণ (ওয়াজহে তাসমিয়া):

এই যুদ্ধটি উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল বলে এর নাম 'গাযওয়ায়ে উহুদ' বা উহুদ যুদ্ধ।

'উহুদ' পাহাড়ের নামকরণের দুটি কারণ ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন:

১. একক ও বিচ্ছিন্ন: 'উহুদ' শব্দটি 'আহাদ' (এক) থেকে এসেছে। মদিনার অন্যান্য পাহাড়গুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত বা সারিবদ্ধ, কিন্তু উহুদ পাহাড়টি সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে এককভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণে একে উহুদ বলা হয়।

২. তাওহিদের প্রতীক: রাসুলুল্লাহ (সা.) এই পাহাড়কে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বলেছেন: "উহুদ এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।" হয়তো তাওহিদের সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে এর নাম উহুদ।

---

৫. উহুদ যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করো। (بين نتائج غزوة احد)

উত্তর:

উহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা ও শিক্ষার বিষয়। এর ফলাফল ছিল মিশ্র:

১. প্রাথমিক বিজয় ও পরে বিপর্যয়:

যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমরা কাফেরদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। কাফেররা পালাতে শুরু করে। কিন্তু মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী (যারা পাহাড়ের পাসে ছিল) রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গনীমত সংগ্রহের জন্য স্থান ত্যাগ করে। এই সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদ (তখন কাফের) পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

২. জানমালের ক্ষতি:

এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শহীদ হন (যার মধ্যে রাসুল সা.-এর চাচা হামজা রা. অন্যতম)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র দন্ত মোবারক শহীদ হয় এবং চেহারা মোবারক আহত হয়। গুজব রটে যায় যে নবীজি নিহত হয়েছেন।

৩. কাফেরদের ব্যর্থতা:

যদিও মুসলিমরা সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু মক্কার কাফেররা মদিনা দখল করতে পারেনি বা মুসলিমদের পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। তারা দ্রুত মক্কায় ফিরে যায়। তাই একে মুসলিমদের চূড়ান্ত পরাজয় বলা যায় না।

৪. শিক্ষণীয় দিক:

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বোঝালেন যে, রাসুল (সা.)-এর নির্দেশের বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা বিজয়ের মুহূর্তেও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এটি ছিল ইমানি তরবিয়তের এক মহাক্লাস।

---

৬. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা কত ছিল? এবং কতজন শহীদ হয়েছিলেন? (كم كان عدد المسلمين في غزوة احد؟ وكم قتلوا فيها ؟)

উত্তর:

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনা থেকে রওয়ানা হন, তখন মুসলিম বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল ১০০০ জন।

পথিমধ্যে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার ৩০০ জন অনুসারী নিয়ে দল ত্যাগ করে মদিনায় ফিরে যায়।

ফলে যুদ্ধের ময়দানে অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০ জন।

এর মধ্যে মাত্র ২ জন অশ্বারোহী এবং ৫০ জন তীরন্দাজ ছিলেন।

শহীদের সংখ্যা:

উহুদ যুদ্ধে মোট ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

- এর মধ্যে ৬৪ জন ছিলেন মদিনার আনসার সাহাবি।
- ৬ জন ছিলেন মক্কার মুহাজির সাহাবি।

- মুহাজিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এবং মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)।

অপরদিকে কাফেরদের পক্ষে নিহত হয়েছিল ২২ বা ২৩ জন।

---

৭. উহুদ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? (متى وقعت غزوة احد؟)

উত্তর:

ঐতিহাসিকদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরি সনে।

মাসের নাম: শাওয়াল মাস।

তারিখ: শাওয়াল মাসের ৭, ১১ বা ১৫ তারিখ (মতভেদ আছে, তবে ৭ বা ১৫ শাওয়াল প্রসিদ্ধ)।

বার: শনিবার।

বদরের যুদ্ধের ঠিক এক বছর পর মক্কার কাফেররা বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ৩০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে এসেছিল।

---

৮. তীরন্দাজ বাহিনীতে কতজন লোক ছিল? এবং তাদের আমিরের নাম কী? (كم رجلا كان في الرماة؟ ومن كان اميرهم؟)

উত্তর:

উহুদ যুদ্ধের কৌশলের অংশ হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) পাহাড়ের একটি গিরিপথ বা পাসে তীরন্দাজদের নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে কাফেররা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

সংখ্যা:

এই বিশেষ তীরন্দাজ বাহিনীতে মোট ৫০ জন সাহাবি ছিলেন।

আমির বা সেনাপতি:

রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দলের আমির নিযুক্ত করেছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন: "আমরা জয়লাভ করি বা পরাজিত হই, তোমরা আমাদের লাশ পাখি খেতে দেখলেও—আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না।"
দুর্ভাগ্যবশত, যুদ্ধের শেষে গনীমত সংগ্রহের লোভে ৪০ জন সাহাবি স্থান ত্যাগ করেন, কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) ও ৯ জন সঙ্গী শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন এবং শহীদ হন।

---

৯. 'জানাজা' (الجنائز) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الجنائز لغة وشرعا ؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'জানাজা' (جنازة) শব্দটি আরবি। এটি 'জানাজ' (جنز) ধাতু থেকে এসেছে।

- যদি 'জিম'-এ ফাতহা (জবর) দিয়ে পড়া হয় (**জানাজাহ**), তবে এর অর্থ: **মৃতব্যক্তি বা লাশ**।
- যদি 'জিম'-এ কাসরা (জের) দিয়ে পড়া হয় (জিনাজাহ), তবে এর অর্থ: লাশ বহনকারী খাটিয়া।

মূল অর্থ: ঢেকে রাখা বা গোপন করা।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায় জানাজা হলো:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لِلدُّعَاءِ لَهُ

অর্থ: মৃতব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও দোয়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে যে নামাজ আদায় করা হয়।

এটি জীবিতদের ওপর মৃতদের একটি হক এবং এটি আদায় করা 'ফরজে কিফায়া' (সমাজের কিছু লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়)।

---

১০. শহীদদের জানাজা পড়া সম্পর্কে আলেমদের উক্তিগুলো কী কী? (ما هي اقوال العلماء في الصلوة على الشهداء؟)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এটি ১ নং প্রশ্নের অনুরূপ। এখানে সংক্ষেপে মূল বক্তব্য দেওয়া হলো)

- **ইমাম শাফেয়ি (রহ.):** *"লা ইউসাল্লা আলাইহিম"* (তাদের ওপর নামাজ পড়া হবে না)। কারণ জাবের (রা.)-এর হাদিস। এবং তারা জীবিত, মৃতের নামাজ তাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** *"ইউসাল্লা আলাইহিম"* (তাদের ওপর নামাজ পড়া হবে)। কারণ জানাজা একটি দোয়া ও সম্মান। হামজা (রা.)-এর জানাজা পড়া হয়েছে। জাবের (রা.)-এর হাদিসটি বিশেষ পরিস্থিতির বা রহিত।
- **ইমাম আহমদ (রহ.)-এর একটি মত:** নামাজ পড়া বা না পড়া—উভয়টির ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) আছে। পড়লে সওয়াব, না পড়লে গুনাহ নেই।

---

১১. জানাজার নামাজ কখন বিধিবদ্ধ (মাশরু) হয়? (متى شرعت صلوة الجنازة ؟)

উত্তর:

জানাজার নামাজ কখন ফরজ হয়, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. মক্কি জীবনে (দুর্বল মত): কেউ কেউ বলেন, মক্কায় ফরজ হয়েছিল কিন্তু গোপনে পড়া হতো। যেমন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় জানাজার হুকুম ছিল না।

২. ১ম হিজরি (প্রসিদ্ধ মত): অধিকাংশের মতে, মদিনায় হিজরতের পর ১ম হিজরি সনে জানাজার নামাজ বিধিবদ্ধ হয়। সর্বপ্রথম জানাজা পড়া হয় আনসার সাহাবি আসাদ ইবনে জুরারাহ (রা.) অথবা বারা ইবনে মারুর (রা.)-এর।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আসাদ ইবনে জুরারাহ (রা.)-এর জানাজায় তাকবির বলেছিলেন। এর আগে জানাজা ছাড়াই দাফন করা হতো।

---

১২. গায়েবানা জানাজা (অনুপস্থিত লাশের নামাজ) কি জায়েজ? মতভেদ ও দলিলসহ লেখ। (هل تجوز صلوة الجنازة على الغائب؟ وما الاختلاف فيه؟ فصل بالادلة)

উত্তর:

মৃতদেহ সামনে না রেখে দূরে অবস্থান করে জানাজা পড়াকে 'সালাতুল গায়েব' বা গায়েবানা জানাজা বলে।

১. শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব:

গায়েবানা জানাজা পড়া জায়েজ।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাশির মৃত্যুর খবর মদিনায় পেয়ে সাহাবিদের নিয়ে ঈদগাহে গায়েবানা জানাজা পড়েছিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

২. হানাফি ও মালিকি মাযহাব:

গায়েবানা জানাজা পড়া নাজায়েজ। জানাজার জন্য লাশ সামনে থাকা শর্ত।

- **হানাফিদের জবাব:** নাজ্জাশির ঘটনাটি ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য **'খাস' বা বিশেষ মোজেজা**। আল্লাহ তাআলা মদিনা থেকে হাবশা পর্যন্ত সমস্ত পর্দা সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং নাজ্জাশির লাশ রাসুল (সা.)-এর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। তাই তিনি দেখে দেখেই নামাজ পড়েছেন, গায়েবানা নয়।
- **যুক্তি:** রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবি মদিনার বাইরে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু নাজ্জাশি ছাড়া আর কারো গায়েবানা জানাজা পড়ার প্রমাণ নেই।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাবে গায়েবানা জানাজা সহিহ নয়।

---

১৩. জানাজার লাশ দেখে দাঁড়ানোর হুকুম কী? মতভেদ উল্লেখ করো। (ما هو حكم القيام للجنازة؟ وما الاختلاف فيه؟ بين)

উত্তর:

রাস্তা দিয়ে জানাজা যেতে দেখলে বসে থাকা ব্যক্তির দাঁড়িয়ে যাওয়া বা সম্মান প্রদর্শন করা নিয়ে মতভেদ আছে।

১. মানসুখ (রহিত) মত:

শুরুর দিকে হুকুম ছিল—জানাজা দেখলে দাঁড়াতে হবে, তা মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

- **দলিল:** একবার এক ইহুদির লাশ যাচ্ছিল, রাসুল (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবিরা বললেন, "এ তো ইহুদি।" তিনি বললেন, "তা কি প্রাণ নয়?"

২. বর্তমান হুকুম (হানাফি ও শাফেয়ি):

জানাজা দেখে দাঁড়ানো মুস্তাহাব নয়, বরং বসে থাকাই উত্তম। আগের হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে।

- **দলিল:** হযরত আলী (রা.) বলেন:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) (প্রথমে) দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর (পরবর্তীতে) বসেছিলেন (দাঁড়াননি)। (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে দাঁড়ানোর হুকুমটি মানসুখ। তবে কেউ যদি মৃতের সম্মানে বা সাহায্যের জন্য দাঁড়ায়, তবে তা জায়েজ।

---

১৪. মসজিদের ভেতরে জানাজার নামাজ পড়ার বিধান কী? দলিলসহ লেখ। (ما الاختلاف في صلوة الجنازة في المسجد؟ بين بالادلة)

উত্তর:

১. হানাফি মাযহাব:

মসজিদের ভেতরে (বিনা ওজরে) জানাজার নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমি। লাশ মসজিদের ভেতরে থাক বা বাইরে, নামাজি মসজিদের ভেতরে থাকলে মাকরুহ হবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

অর্থ: যে ব্যক্তি মসজিদের ভেতরে জানাজা পড়ল, তার কোনো সওয়াব নেই (বা নামাজ হবে না)। (আবু দাউদ)

- **কারণ:** মসজিদ বানানো হয়েছে নিয়মিত নামাজের জন্য, জানাজার জন্য নয়। এতে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২. শাফেয়ি মাযহাব:

মসজিদের ভেতরে জানাজা পড়া জায়েজ এবং মুস্তাহাব (যদি মসজিদ নোংরা হওয়ার ভয় না থাকে)।

- **দলিল:** উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর জানাজা মসজিদে নববিতে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, *"রাসুলুল্লাহ (সা.) তো সুহাইল ইবনে বায়দার জানাজা মসজিদেই পড়েছিলেন।"* (সহিহ মুসলিম)

হানাফিদের জবাব: সুহাইল ইবনে বায়দার জানাজা মসজিদের মূল অংশের বাইরে বা সংলগ্ন স্থানে পড়া হয়েছিল, ভেতরে নয়।

---

১৫. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (بين نبذة من حياة جابر بن عبد الله (رض)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম জাবের, পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন)। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার আনসার সাহাবি। তাঁর উপনাম 'আবু আব্দুল্লাহ'।

ইসলাম গ্রহণ ও বায়আত:

তিনি শৈশবে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের আগে 'আকাবার শেষ রাতে' পিতা আব্দুল্লাহর সাথে তিনিও রাসুল (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন কিশোর।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ:

তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে পিতার নির্দেশে বোনদের দেখাশুনার জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেননি (বা ছোট ছিলেন)। উহুদের পর তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে **১৯**টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিফফাইন ও জঙ্গে জামাল-এর যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিলেন।

ইলমি অবদান:

তিনি ছিলেন 'মুকাসসিরিন' সাহাবিদের (অধিক হাদিস বর্ণনাকারী) অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০টি। তিনি মসজিল নববিতে হাদিসের দরস দিতেন। ইমাম বাকির (রহ.) ও ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) তাঁর ছাত্র ছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি দীর্ঘদিন হায়াত পেয়েছিলেন। ৭৮ হিজরি সনে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনার গভর্নর আবান ইবনে উসমান তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন মদিনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবিদের একজন।